ঃ ত্রয়োদশ শারদ সংখ্যা ঃ

মহালয়া // ১০ আশ্বিন, ১৪২৬ // শনিবার

সূচীপত্র **২**

মাস নিয়ে মাস কাবার
বাসুদেব ভট্টাচার্য ৪

পৃথিবীর চাঁদ ও ইসলাম ধর্ম
সন্দীপ বাগ ৮

চলুন চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করি
ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ ১৪

চাঁদের জমি বেচাকেনা ও এক ডজন চন্দ্রাভিযাত্রী
ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৬

গরুর গাড়ির চাকায় চেপে চাঁদের দেশে
জহর চট্টোপাধ্যায় ১৯

চাঁদের গান
সুজয় বাগচী ২২

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় চন্দ্র
সৌমেন নাথ ২৫

চাঁদের ছবি তোলা নিয়ে দু'চার কথা
প্রদীপ ভট্টাচার্য ২৯

চাঁদের কিসসা
পল্টু ভট্টাচার্য ৩৩

সাধের চাঁদ
তাপস বাগ ৩৫

হঠাৎ যদি চাঁদ হারিয়ে যায়
পারমিতা সরকার ৩৭

কবিতা ঃ

চাঁদ
প্রিয়া কুণ্ডু নন্দী ৩২

চাঁদের বুড়ি (১)
প্রণবকুমার দাস ৩৮

চাঁদের বুড়ি (২)
সুজয় বাগচী ৩৮

মানুষের চন্দ্রাভিযান
শ্রাবস্তী ব্যানার্জী ৩৯

এক কল্পনাতীত ফাইনাল ম্যাচ
সুরজিৎ দাস ৪০

ছবিতে চাঁদ - ১ ২৪
ছবিতে চাঁদ - ২ ২৮

M/S Techno Fabricating Concern

Shanpur Bhagwan Das Math, P.O.- Dasnagar, Howrah-711105

Manufacturing of Impeller, Ducting, Casing, Chassis, Floor Plate, Gear Box etc.

Contact with -- Radha Raman Hazra & Kamalesh kumar Manna
Ph. - (033) 2667-6926

সম্পাদকীয়

পত্রিকা গুটিগুটি পায়ে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়ল। তেরোর গেরো একটা থাকেই বোধহয় আর সে কারণেই এবারের গেরো ছিল সঠিক সময়ে লেখা পাওয়া। বিশেষ করে এবারের বিষয় যখন 'চাঁদ'। চাঁদ মেল না ফিমেল বলা মুশকিল কারণ শিশুদের কাছে চাঁদ মামা আবার কবির কাছে রূপবতী অপ্সরা। পুরাণমতে চাঁদের সাতাশ পত্নী প্রতি রাতে এক এক পত্নী অর্থাৎ এক এক নক্ষত্রের কাছে গমন। অমাবস্যায় নিকষ কালো রূপ থেকে কাস্তের আকারে পূর্ণিমার অপরূপ চাঁদের বেড়ে ওঠার শুরু। জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় চরাচরপ্লাবিত সৌন্দর্যের রূপ সত্যিই বর্ণনাতীত। মানুষের সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই চাঁদ মানুষের সঙ্গী। আকাশে চাঁদের চলাচল দেখেই তৈরি হয়েছিল ক্যালেন্ডার। সামাজিক ও ধর্মীয় নানা উৎসবে চাঁদের গুরুত্ব প্রাচীনকালের মত এখনও অপরিসীম।

চাঁদই মহাকাশের একমাত্র জ্যোতিষ্ক যেখানে মানুষের পা পড়েছে। মহাকাশ অভিযানের পাঁচদশক পূর্ণ হয়েছে কয়েকবছর আগে আর এবছর বিশেষত মানুষের চন্দ্রাভিযানের গোল্ডেন জুবিলীর বছর। খুবই আনন্দের কথা যে ভারত এবছর দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযানে অংশ নিয়েছে। ইসরোর বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় চন্দ্রায়ন-২ অভিযান সফল হোক।

ছোটবেলায় দেখা চাঁদের বুড়ি এখন নিছকই রূপকথা কিন্তু মানুষের সমাজ জীবনে চাঁদ বারেবারে ফিরে ফিরে এসেছে -- কল্পকথায়, প্রত্নতত্ত্বে, গল্পে, গানে, কবিতায়, সাহিত্যে, সিনেমায় ও নানা অনুসঙ্গে। এবারের সংখ্যায় সেইসব নিয়েই কিছু লেখা থাকছে। পত্রিকা কেমন হয়েছে সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞাপনদাতা ও সমস্ত শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বিয়ের আগে কুষ্ঠি বিচার করুন বা না করুন,
অবশ্যই থ্যালাসেমিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা করান।

ASHA

(Amoragori Social & Humanitorian Association)

Ph. 9800286148

সুর ও কথা

আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক শিক্ষা কেন্দ্র

ঃ প্রতি শনিবার ঃ

মাধব ঘোষ লেন, খুরুট,

ঃ প্রতি রবিবার ঃ

ডুমরাজলা, এইচ. আই. টি. কোয়ার্টার্স

যোগাযোগ - ৮০১৩৩৭৮১৬৫/৯৮৩০৪৭৬০২০

With Best Compliments From

A WELL WISHER

SAROJIT MANNA

মাস নিয়ে মাস কাবার

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য

মাস কয় প্রকার ?

প্রশ্নটার উত্তর সাদা-মাটা — দুই প্রকার। ইংরেজী মাস ও বাংলা মাস। কিন্তু কোনও আকাশ বিষয়ে পন্ডিতের সামনে মুখ ফসকে প্রশ্নটা করে ফেললে ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে। তিনি হয়তো 'অবাক জলপান'-এর মতো লম্বা লিস্টি দিয়ে বলবেন — নক্ষত্র মাস, চান্দ্র মাস, সৌরমাস, গ্রহণমাস, পরিমাস, অধিমাস, মলমাস, ক্ষয়মাস - কটা চাই সর্বনাশ ! থাক্ বাবা, এর চেয়ে ইংরেজী মাস আর বংলা মাসই ভালো। আমাদের যাবতীয় সরকারী-বেসরকারী কাজকর্ম হয় ইংরেজী মাসের ক্যালেন্ডার অনুসারে। কিন্তু সারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে এখনো যে মাস অবলম্বন করে বছর কাটে সেটা হ'লো বাংলা মাস। আর পুজো-আর্চা ও বছরের দিনপঞ্জির জন্য আছে চান্দ্রমাস আর সৌরমাস মেশানো বাংলা ক্যালেন্ডার। ব্যাপারটা খুব মজাদার।

চান্দ্রমাস ঃ অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ দিনের হিসেব করেছে সূর্যের উদয়াস্ত দেখে, আর মাসের হিসেব করেছে চাঁদের কলার পরিবর্তন দেখে। এক পূর্ণিমার পর থেকে পরের পূর্ণিমা, কিংবা এক অমাবস্যার পর থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত সময়টাকে বলে এক চান্দ্রমাস। এই সময়টা হ'ল ২৯.৫ দিন।

সৌরমাস ঃ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বৎসরের সঙ্গতি রাখার জন্য পরবর্তীকালে সৌরমাসের অবতারণা করা হয়েছে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির (সূর্যপ্রদক্ষিণ) জন্য আপাতদৃষ্টিতে আমরা সূর্যকে আকাশের প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তাকার পথে পশ্চিম থেকে পুবে আবর্তন করতে দেখি। এই বৃত্তটিকে বলে রবিপথ বা ক্রান্তিভাগের (Ecliptic)। ক্রান্তিবৃত্তকে সমান ১২টি ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগের তারামণ্ডলীগুলিকে বলে রাশি (মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি) আর, একটা রাশি অতিক্রম করতে সূর্য যে সময় নেয় তাকে বলে সৌরমাস।

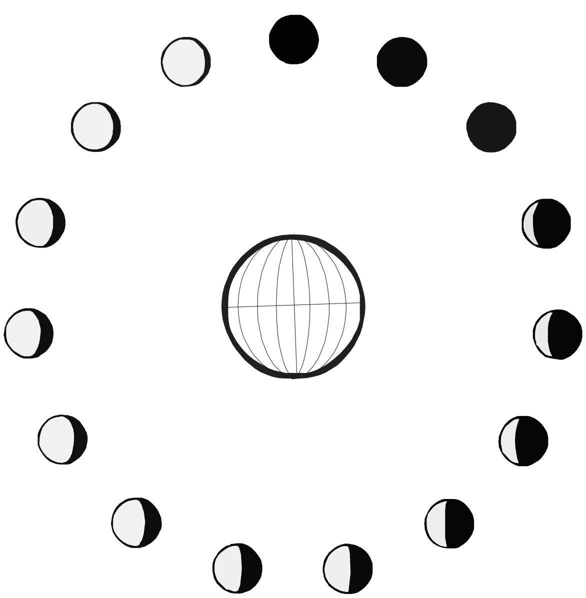

বাংলা ক্যালেন্ডার ঃ বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার রচনা করা হয় সৌর মাস অর্থাৎ বারোটা রাশির একেকটাতে সূর্য যতদিন অবস্থান করে সেই অনুসারে। কিন্তু বাংলা ক্যালেন্ডার প্রকৃতপক্ষে সৌরমাস ও চান্দ্রমাসের মিশেল। এর মাসগুলি আদতে খাঁটি সৌরমাস এবং এই সৌরমাসের মধ্যেই চান্দ্রমাসও চলতে থাকে। বাংলা মাসের নামকরণটা অদ্ভুত মজাদার।

যেমন, বৈশাখ মাস দিয়ে আমাদের বাংলা বছরের শুরু এবং রাশি চক্রের শুরু ধরা হয় মেষ রাশি দিয়ে। আর সূর্য বৈশাখ মাসে থাকে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে ইত্যাদি। কোনো মাসের শেষ দিন (সংক্রান্তি) সে পরের রাশিতে সংক্রমণ করে বা প্রবেশ করে। কিন্তু 'বৈশাখ' নামটি দেওয়া হয়েছে যে নক্ষত্রটি থেকে সেই 'বিশাখা' নক্ষত্র কিন্তু মেষ রাশিতে নেই, আছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকের রাশি 'তুলা' রাশিতে (বোঝ কাণ্ড!)। এমন কেন ? কারণ কোন সৌর মাসের (যেমন, বৈশাখ) প্রথম অমাবস্যার পর সেই চান্দ্রমাস (চান্দ্র বৈশাখ) শুরু হয় এবং চলে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত। নিয়ম হলো কোনো চান্দ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে (বরং বলা ভালো, পূর্ণিমা ছাড়ার সময়) চাঁদ যে নক্ষত্রের নিকটে অবস্থান করে সেই অনুসারে মাসটির নামকরণ হয়। নিচে প্রতিমাসে সূর্য ও চন্দ্রের (পূর্ণিমাতে) অবস্থান দেওয়া হলো।

মাস	সূর্যের অবস্থান (রাশিগত)	পূর্ণিমাতে চন্দ্রের অবস্থান (নক্ষত্র ও রাশি)
বৈশাখ	মেষ	বিশাখা (তুলা)
জ্যৈষ্ঠ	বৃষ	জ্যেষ্ঠা (বৃশ্চিক)
আষাঢ়	মিথুন	পূর্বাষাঢ়া / উত্তরাষাঢ়া (ধনু)
শ্রাবণ	কর্কট	শ্রবণা (শ্যেনমন্ডল, Aquila)
ভাদ্র	সিংহ	পূর্বভাদ্রপদা / উত্তরভাদ্রপদা / পেগাসাস (Pegasus) মণ্ডল, (মীন রাশি সংলগ্ন)
আশ্বিন	কন্যা	অশ্বিনী (মেষ)
কার্তিক	তুলা	কৃত্তিকা (বৃষ)
অঘ্রাণ (মার্গশীর্ষ)	বৃশ্চিক	মৃগশীর্ষ / মৃগশিরা (কালপুরুষ)
পৌষ	ধনু	পুষ্যা (কর্কট)
মাঘ	মকর	মঘা (সিংহ)
ফাল্গুন	কুম্ভ	পূর্বফাল্গুনী / উত্তরফাল্গুনী (সিংহ)
চৈত্র	মীন	চিত্রা (কন্যা)

আমাদের বাংলা (সৌর) ক্যালেন্ডার এবং তাতে বিভিন্ন মাসের দিন সংখ্যা অন্যান্য যে কোনো দেশের ক্যালেন্ডার এর চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞান (জ্যোতির্বিজ্ঞান) সম্মত। বিভিন্ন রাশিতে সূর্যের অবস্থিতিকাল অনুসারে বাংলা মাসের দৈর্ঘ্য ২৯ থেকে ৩২ দিন পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ায় পৃথিবীর গতিবেগ সর্বত্র সমান নয়, অনুসূর অবস্থানে এর বেগ সবচেয়ে বেশি, অপসূর অবস্থানে সবচেয়ে কম হয়। পৌষ মাসের মাঝামাঝি (জানুয়ারীর শুরুতে) পৃথিবী তার কক্ষপথে অনুসূর (সূর্যের নিকটতম) অবস্থানে পৌঁছায়। তাই এই সময় তার অর্থাৎ আপাতত দৃষ্টিতে সূর্যের গতিবেগ বেশি থাকে বলে একটা রাশি পেরোতে তার কম সময় লাগে। সেই কারণে অঘ্রান, পৌষ অথবা মাঘ মাস (প্রায়ই তিনটির মধ্যে দুটো মাস) ২৯ দিনে হয়। এরপর থেকে মাস বড়ো হতে থাকে। জুলাই-এর শেষে পৃথিবী তার কক্ষপথের অপসূর (সূর্য থেকে দূরতম) অবস্থানে আসে। এই সময় পৃথিবীর গতিবেগ সবচেয়ে কম হয়, তাই একটা রাশি পেরোতে সূর্যের আপাতভাবে বেশি সময় লাগে। সেই কারণে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের দৈর্ঘ্য বেড়ে ৩২ দিন পর্যন্ত হয়।

চান্দ্রবছর আর সৌর বছর ঃ চান্দ্রমাস হয় চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণজনিত চন্দ্রকলার পরিবর্তন অনুসারে। এক অমাবস্যার পর থেকে ফের অমাবস্যা (কিংবা এক পূর্ণিমার পর থেকে ফের পূর্ণিমা) পর্যন্ত সময়টা হল এক চান্দ্রমাস। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চাঁদের কলা চক্র অনুযায়ী হিসেব করে এসেছে। চান্দ্র মাসে ২৯১/২ দিন, আর ১২টা চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বছর। অর্থাৎ সর্বমোট ২৯১/২ X ১২ = ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র বছর।

কিন্তু এতে ঋতুচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে চান্দ্রবছর খাপ খায়না। তাই ঋতুচক্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে ধারণা করা হয়েছে সৌর বছর - সূর্যের উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন চক্র লক্ষ্য করে। এটা যে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ কালের সাথে এক এবং পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এই সত্যটা মানুষ অনেক পরে জেনেছে। যাই হোক, পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ কাল ও তার জন্য ঋতু পরিবর্তনের চক্রের এই ব্যাপ্তি ৩৬৫ দিন। তাই ৩৬৫ দিনে হয় এক বছর (সৌর বছর), আর ৪ বছর ধরে বাকি ১/৪ দিন যোগ করলে লিপ ইয়ারে একটা গোটা দিন বাড়ে। তাই লিপইয়ার হয় ৩৬৬ দিনে। সেই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন বেশি অর্থাৎ ২৯ দিন ধরা

হয়। আর সৌরবছর ও চান্দ্র বছরের এই তারতম্যের জন্যই ঘটেছে যত গণ্ডগোল।

অধিমাস, মলমাস, ক্ষয়মাস আর ব্লু-মুন ঃ

মজা হলো চান্দ্রমাস (চাঁদের দিকে লক্ষ্য রাখলে) চোখেই বোঝা যায়, কিন্তু সৌর মাসের আদি অন্ত ক্যালেন্ডার না দেখে বোঝা যায় না। চান্দ্র বছর হয় ৩৫৪ দিনে আর সৌর বছর হয় ৩৬৫ দিনে। অর্থাৎ প্রতিবছর (সৌর বছর বা আমরা যাকে বছর বলি) বারোটা চান্দ্রমাস হয়েও (৩৬৫ - ৩৫৪) ১১ দিন উদ্বৃত্ত থাকে। অতএব আড়াই বা পৌনে তিনবছর পর (অর্থাৎ প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে) একটা চান্দ্রমাস (৩০দিন) বাড়তি হয়। সৌর বছরের সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য এই বাড়তি চান্দ্র মাসটাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বলা হয় অধিমাস।

চাঁদের কলাচক্র তথা চান্দ্রমাস ও চান্দ্র তিথি চোখে লক্ষ্য করা যায় বলে প্রাচীন কাল থেকে ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ও সব ধর্মের মানুষই ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ করেন চান্দ্রমাস অনুসারে। যেমন মুসলিম ধর্মালম্বীরা তাঁদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ করেন হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারে। হিজরি ক্যালেন্ডারের মাসগুলি পুরোপুরি চান্দ্রমাস। এক চান্দ্র বছর এক সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন কম করে এগিয়ে আসে। তাই মুসলমানদের ঈদ, মহরম প্রভৃতি পরবগুলি প্রতিবছর আগের বছরের চেয়ে ১১ দিন আগে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঋতুর কোনো ব্যাপার নেই।

কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটা সমস্যা আছে। এঁদের কিছু কিছু অনুষ্ঠান হয় নির্দিষ্ট মাসের সংক্রান্তিতে। যেমন ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পুজো, কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক পুজো, পৌষ সংক্রান্তিতে মকরস্নান ও পিঠেপার্বন, চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলের গাজন ও চড়ক পুজো ইত্যাদি। আবার কিছু পুজো হয় নির্দিষ্ট ঋতুতে, তিথি মেনে। যেমন শরৎকালে (শারদীয়া) দুর্গাপূজা, বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতীপুজো, বাসন্তী পূর্ণিমায় দোল উৎসব (হোলি)। দুর্গাপূজা শুক্লা সপ্তমীতে শুরু করতে গিয়ে প্রতিবছর ১১ দিন এগোতে এগোতে বর্ষাকালে গিয়ে পড়লে তা চলবে না। কিংবা সরস্বতী পুজো ১১ দিন করে এগোতে এগোতে ডিসেম্বরে বা পৌষ মাসে এসে পড়লে, সেটা হবে না। কাজেই ঋতুর সাথে চান্দ্রমাসের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে অধিমাসের মতো প্রতি তৃতীয় বৎসরের শেষ দিকে যে মাসে দুটো অমাবস্যা পড়ে (ক্যালেন্ডারের বারো মাসে তেরোটা চান্দ্রমাস অর্থাৎ তেরোটা অমাবস্যা হতে গেলে কোনো একমাসে দুটো অমাবস্যা হতে হবে) সেই দুই অমাবস্যার মধ্যবর্তী চান্দ্রমাসটাকে 'মলমাস' ধরা হয়। এই মাসে সমস্ত রকম পুজো-আর্চা ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ। ধর্মীয়কাজে ছন্দ পতন। এরপর থেকে আবার ছন্দে ফিরে আসা।

অবশ্য একই সৌর মাসের মধ্যে দুটো অমাবস্যা পড়লেই যে সেটা 'মলমাস' হতে হবে তা নয়। মলমাস ছাড়াও এক বাংলা মাসে দুটো অমাবস্যা পড়তে পারে।

কেমন করে ?

আমরা দেখেছি পৌষ মাসে পৃথিবী অনুসূর অবস্থান অতিক্রম করে বলে তার গতিবেগ বেশি থাকে এবং তাই আপাতভাবে সূর্য অল্প সময়েই একটা রাশি অতিক্রম করে। অঘ্রান, পৌষ কিংবা মাঘে ২৯ দিনেই সৌরমাস সমাপ্ত হয়। এই রকম কোনো ২৯ দিনের মাসের মধ্যে তো কোনো অমাবস্যা নাও পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে সেই মাসের আগের কিংবা পরের ৩০ দিন যুক্ত মাসে দুটো অমাবস্যা পড়বে । ঐ অমাবস্যাহীন মাসটা ক্ষয়মাস বলে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে দুই অমাবস্যাযুক্ত মাসটা আর 'মলমাস' হবে না। এটাই নিয়ম।

ব্লু-মুন রহস্য ঃ

আমরা দেখেছি যে চান্দ্রমাস আর সৌরমাসের পার্থক্যের কারণে বারো মাসে (৩৬৫ দিন) বারোটা চান্দ্রমাস (৩৫৪দিন) হয়েও একটা বছরের ১১ দিন বাড়তি থাকে। এর ফলে হয় ধর্মীয় পরবগুলি প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে, না হলে প্রত্যেক তৃতীয় বছরে একটা করে 'মলমাস' হাজির হয় (হিন্দু পরবগুলির ক্ষেত্রে)। হিজরি ক্যালেন্ডার পুরোপুরি চান্দ্রমাস অনুযায়ী বলে হিজরি বছর (মুসলমানদের অনুসৃত) — যা শুরু হয় মহরম দিয়ে, সেই বছরটাও সরতে থাকে অর্থাৎ প্রতি বছর ১১ দিন করে এগোতে থাকে। আর চান্দ্রমাস ও সৌরমাস নিয়ে এই সমস্যা পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। ইউরোপেও ঘটেছে এই সমস্যা।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গীর্জার পাদরিগণ বিশেষ করে কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য একপ্রকার পঞ্জিকা প্রণয়ন করতেন। একে বলা হতো Farmer's Almanac। তাতে কখন কী করণীয় সেটা বোঝা যেতো তাতেও পূর্ণিমা দেখে ১২টি পূর্ণিমায় বছরের কার্য সমাধা হতো এবং প্রত্যেকটা পূর্ণিমার একটা করে নামও দেওয়া হতো। তাদের বছর শুরু হতো ইয়ুল (Youl) এর পর থেকে শীতকাল। দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস (Winter Solstic) ও

বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টানদের পালিত উৎসব হলো ইয়ুল।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত Main Farmer's Almanac তথা কৃষকদের জন্য তৈরি ক্যালেন্ডার অনুসারে - চারটি ঋতুতে অনুসৃত পূর্ণিমাগুলো হলো

1. Moon after yule
2. Wolf moon Hunger moon

Winter moons

3. Lantern moon Snow moon
4. Egg moon
5. Milk moon

Spring moons

6. Flower moon
7. Hay moon
8. Gray moon

Summer moons

9. Fruit moon
10. Harvest moon
11. Hunter's moon

Autumn moons

12. Moon Before yule

এখন মুশকিল হলো প্রতিবছর ১২ টা পূর্ণিমা হয়েও ১১ দিন করে বাড়তি থাকার কারণে মাঝে মধ্যে (প্রায় ৩ বছর বাদে বা ১৯ বছরে ৭ বার) একই বছরে ১৩ টা এসে পড়ে। এই ১৩ নম্বর পূর্ণিমা নিয়ে পাদ্রীরা পড়তেন ফ্যাসাদে। এটাকে কিছুতেই বছরের পূর্ণিমাগুলির সাথে খাপ খাওয়াতে পারতেন না। সেই প্রাচীনকালে এই পূর্ণিমার দিন হিসেব করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তাই এই ১৩ নং পূর্ণিমাটাকে তাঁরা খুব অপয়া দুর্ভাগ্যজনক বা অশুভ মনে করতেন। কেননা সেই বছরে তাঁদের ১২টির বদলে ১৩টি পূর্ণিমার সংস্থান করতে হতো। দুর্নিতিগ্রস্থ পাদ্রীরা তাদের ইচ্ছে মতো কিংবা সুবিধা মতো যে কোনো জায়গায় এটাকে বসিয়ে দিতেন। আর এই ১৩নং পূর্ণিমার নাম দিলেন ব্লু-মুন (Blue Moon) (কেন যে তাদের Honey Moon এর কথা মনে এল না) প্রত্যেক ১৯ বছরে এরকম ৭টি ব্লু-মুন হয়। আর এই অনিশ্চয়তা ও দুর্লভতার কারণেই সম্ভবত "Once in a Blue Moon" কথাটা এসেছে। পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক হয় যে , যে বছরে ১৩টি পূর্ণিমা পড়বে সেই বছর চারটি ঋতুর কোন একটিতে অবশ্যই ৩টির বদলে ৪টি পূর্ণিমা পড়তে হবে। ঐ ৪টির তৃতীয় পূর্ণিমাটার নাম হবে ব্লু-মুন। বাকিগুলির নাম একই থাকবে।

এখনকার দিনের ব্লু-মুন বলতে ২টি পূর্ণিমা যুক্ত ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমাটাকে বোঝায় কিন্তু সেটা ব্লু-মুন-এর তাৎপর্য ও মূল রীতি সম্মত নয়। যেমন, ১৯৩৭ সালে ব্লু-মুন পড়েছিল ২১ আগষ্ট, কিন্তু সেটা মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমা ছিলনা। কোনো ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমাকে ব্লু-মুন আখ্যা দেওয়ার প্রচলন হয় ১৯৪৬ সাল থেকে। সেই বছর আমেরিকার রেডিও ü¥xäÂËõþþÛßÂü±ŽÂÈßÂËü Mr. J. Hugh Pruett নামে এক ব্যক্তি (যতদূর মনে পড়ছে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক) বর্তমান ব্লু-মুন তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর যুক্তিটা ছিল অনেকটা এই রকম —

ব্লু-মুন হতে গেলে যেহেতু ১২ মাসে ১৩ টি পূর্ণিমা হতে হবে তা'হলে নিশ্চয়ই কোনো একটি মাসে দুটি পূর্ণিমা পড়তে হবে। আর সেই মাসের ঐ বাড়তি পূর্ণিমাটাই হবে ব্লু-মুন। পরে ১২ মাসের ১৩ পূর্ণিমার কথা উঠে গিয়ে দুই পূর্ণিমাযুক্ত মাস হলেই দ্বিতীয় পূর্ণিমাকে ব্লু-মুন নাম দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ৩ বছরে ১টি ব্লু-মুন বা ১৯ বছরে ৭টি ব্লু-মুন এর নীতি আর থাকছে না। যেমন ১৯৯৯ সালে জানুয়ারী এবং মার্চ এই দুই মাসেই দুটি করে পূর্ণিমা (২ এবং ৩১ তারিখ) পড়েছিল, আর ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো পূর্ণিমাই হয় নি। কাজেই একই বছরে এক মাস বাদে দু-দুটি ব্লু-মুন হয়েছিল। এর চেয়ে ভারতীয় রীতির 'মলমাস' অনেক বেশি যুক্তি যুক্ত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত।

'ব্লু-মুন' নামের ক্ষেত্রে 'নীল চাঁদ'-এর নীল কথাটা কেন এলো বলা মুশকিল। তবে কদাচিৎ অর্থে ব্লু-মুন ধরলে সত্যি সত্যি অন্তত দুই বার বিশেষ সময়ে চাঁদকে বাস্তবিকই নীল দেখা গিয়েছিল।

একবার ১৮৮৩ সালের ২৭ আগষ্ট, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া (Krakatoa) আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের উত্থিত ছাই ও ধোঁয়া উর্দ্ধাকাশে উঠে পূর্ণিমার চাঁদকে নীলাভ করে দিয়েছিল।

আর দ্বিতীয় বার, সব থেকে বিখ্যাত নীল চাঁদ বা ব্লু-মুন দেখা গিয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে পশ্চিম কানাডার বিশাল বিস্তীর্ণ ও বিধ্বংসী দাবানলের সময় বিশাল আগুন-এর ফলে উত্থিত ধোঁয়ায় ঐ দিন পূর্ণিমার চাঁদ নীল হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমাহীন ফেব্রুয়ারি আর জানুয়ারী-মার্চে ডবল পূর্ণিমার ঘটনা ১৯৯৯ এর আগে ঘটেছিল ১৯৬১ সালে এবং পরে আবার ঘটলো ২০১৮ সালে।

পৃথিবীর চাঁদ ও ইসলাম ধর্ম

সন্দীপ বাগ

'কোথায় ধর্ম খুজছেন?
গতকাল যে চাঁদটা ছিল ঈদের,
সেটাই আগামীকাল রাখি পূর্ণিমার।'

এবছর রাখি পূর্ণিমার প্রাক্কালে বন্ধুর থেকে পাওয়া বার্তাটি যথেষ্ট অর্থবহ। একটাই চাঁদ নিয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন উৎসব ভাবনা। কিন্তু কতটুকুই বা জানি বা জানার চেষ্টা করি পরস্পরকে অন্তর থেকে। এই একই দিনে খবর এল ভারতের সাম্প্রতিক উৎক্ষেপিত মহাকাশযান চন্দ্রযান-দুই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে চাঁদের নিজস্ব কক্ষপথে প্রবেশের মুখে। তাহলে চাঁদকে নিয়ে দু'ধরণের ভাবনার খোরাক পেলাম আমরা —

এক ঃ পৃথিবী থেকে চাঁদকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বোঝার ও ব্যবহারের চেষ্টা।

দুই ঃ হিন্দু - মুসলমানের বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণের উপাদান হিসেবে চাঁদের গুরুত্ব।

পর্ব - এক

চাঁদকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

ক) পৃথিবীর আহ্নিক গতির নিয়ন্ত্রক চাঁদ ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখিয়েছেন প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে সৌর সংসারে জন্ম হয় পৃথিবীর। এর পর প্রায় দশকোটি বছর পর নানা ঘাত প্রতিঘাতে জন্ম হয় পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার। সৌরমণ্ডলে অন্যান্য গ্রহগুলির উপগ্রহদের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় পৃথিবীর সাপেক্ষে উপগ্রহ হিসেবে চাঁদ বেশি ভারী। সেজন্য চাঁদ পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখিয়েছেন - চাঁদ যখন পৃথিবীর উপগ্রহ হয়নি তখন পৃথিবীর আহ্নিক গতি ছিল কখনো আড়াই ঘন্টা, কখনো চার বা ছ'ঘন্টা। আজকের চব্বিশ ঘন্টার দিন-রাত, পৃথিবীতে চাঁদের সবচেয়ে বড় অবদান।

খ) পৃথিবীতে প্রাণসঞ্চারে চাঁদের ভূমিকা ঃ চাঁদ না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হতো কিনা সন্দেহ। আর হলেও উন্নত প্রাণীকূলের জন্ম দেবার মতো সুস্থির পরিবেশ পৃথিবীতে থাকতো না বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আজ পৃথিবীতে আমরা মোটামুটি এক সুস্থির পরিবেশে বাস করছি। পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই মেরু বরফে ঢাকা, নিরক্ষীয় অঞ্চল উষ্ণ। মোটামুটি সময় মেনে ঋতু পরিবর্তন হয়। পৃথিবী নিজের অক্ষরেখা বরাবর চারপাশে পাক খায় এবং যে কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেটা একটা নির্দিষ্ট ২৩.৫ ডিগ্রী হেলে। ৪১০০০ বছরে মাত্র দু-এক ডিগ্রীর বেশি হেরফের হয় না। কারণ পৃথিবীর এই গতি পথকে নিয়ন্ত্রণ করছে চাঁদের মতো ভারী একটি উপগ্রহের অভিকর্ষ শক্তি। ওই যে দু'এক ডিগ্রীর এদিক ওদিক হয়েছিল বলেই এসেছিল তুষার যুগ। হয়েছিল প্রাণের প্রবাহ স্তব্ধ। পৃথিবীতে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার ঘটল যখন পৃথিবী ফিরল নির্দিষ্ট কৌণিক ছন্দে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন চাঁদের অনুপস্থিতিতে চাঁদের অক্ষরেখা ৪৫ ডিগ্রী অবধি হেলে যেতে পারতো। মেরু অঞ্চলে উষ্ণায়ন হত সরাসরি সূর্যের তাপের প্রবাহে। আবার ওদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চল ভরে থাকতো বরফে। পৃথিবীর মতোই মঙ্গলগ্রহেও প্রাণসঞ্চারের সুযোগ ছিল। মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ - ফেবোস ও ডিমাস — এতই ছোটো যে মঙ্গলের গতিপথে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই এই গ্রহটি সূর্যের রোষে পুড়ে ছারখার। মঙ্গলকে বাদ দিলে অন্যান্য গ্রহদের (বুধ আর শুক্র বাদে, এরা উপগ্রহহীন) উপগ্রহ ১৮৩টি। এর মধ্যে কেবল বৃহস্পতির আছে ৭৯টি উপগ্রহ। সৌরজগতে সবচেয়ে বড় উপগ্রহ গ্যানিমিড বৃহস্পতি পরিবারের সদস্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃহস্পতির মতো বৃহৎ গ্রহের সামনে গ্যনিমিড বামন উপগ্রহ। বৃহস্পতি ১২৮৩৮টি গ্যানিমিডের ওজনের সমান। তাই বৃহস্পতির ওপর কোন প্রভাব ফেলার ক্ষমতা এই উপগ্রহের নেই। অন্যদিকে চাঁদের তুলনায় পৃথিবী মাত্র ৮১ গুণ ভারী। সেই জন্যই চাঁদের প্রভাব পৃথিবীতে এত বেশি। এর ফলে পৃথিবীর উপকারই হয়েছে। সুজলা, শস্য শ্যামলা পৃথিবীতে জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে। সুস্থির জলবায়ু ও পরিবেশ মানুষকে বৌদ্ধিক বিকাশের চরম

পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

পর্ব - দুই ঃ চাঁদ ও মুসলমান সমাজ

হিন্দু - মুসলমানের বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণের উপাদান হিসেবে চাঁদের গুরুত্ব

আলোচনার শুরুতে একটি ছোট গল্পের আশ্রয় নেওয়া যাক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যকার সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প 'আদাব' খানিকটা চাঁদ নির্ভর। এটি বাংলাদেশের ১৯৪৬ সালের হিন্দু মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা। চাঁদ দেখা গেছে আকাশে, ঘোষণা হয়েছে আগামীকাল ঈদ। গল্পের চরিত্র দুটিই নামহীন। সুতাকলের শ্রমিক - হিন্দু এবং নৌকার মাঝি - মুসলমান। শহরে কারফিউ, ইংরেজ পুলিশের সশস্ত্র দাপাদাপির মধ্যে তাড়া খেয়ে পথ ভুলে দুটি মানুষ আলাদা আলাদা ভাবে আশ্রয় নিয়েছে ডাস্টবিনের পাশে মরার মতো শুয়ে। একজন অপরজনের নড়াচড়ার দিকে নজর করে ভাবলো বোধহয় কুকুর। ক্রমে পরস্পর পরস্পরকে মানুষ মনে হওয়ায় মনে ঘোরতর সন্দেহ — অপরজনের হাতে খুন হতে হবে না তো। সামান্য আস্থা ফিরতে শুরু হল নীচুস্বরে কথপোকথন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিকটজনকে হারিয়ে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সুতোকলের শ্রমিক সামান্য রাজনীতি সচেতন, ঝরে পড়ল অন্তরের ঘৃণা - 'ন্যাতারা হৈই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুমজারি কইরা বইয়া রইল আর জালায় মরতে মরলাম আমরাই।' বিপদ কমেছে বুঝে দুজনেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক যাবার পর মাঝি তার ঘাটে যাবার রাস্তা খুঁজে পেল। রাস্তা পেরোলেই মুসলমানদের এলাকা, তার আর ভয় নেই। আর ঘাটে গিয়ে নদি পেরোলেই তার গ্রাম। মাঝি বাড়ি যাবার জন্য উতলা হতেই শ্রমিক বাধা দিল। মাঝির তো আর তর সয় না, কইল 'বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আজ চান্দ্ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিনব্, বাপজানের কোলে চরব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে।' শেষমেষ রাস্তা থেকে বিপদ গেছে ভেবে মাঝি বন্ধুকে 'আদাব' জানিয়ে দৌড়াল। খানিকটা যেতেই সুতাকলের শ্রমিক দেখল - মাঝির হাতে থাকা পোলাপান ও বিবির জন্য কেনা হাতের পুটুলিতে থাকা জামাকাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ডাকাত ভেবে ইংরেজ পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে লুটিয়ে পড়েছে সে। মাঝির ছাওয়ালদের আর বিবির চোখের পানিতে ভাসল পরবের দিন। এটা শুধু গল্প নয় একটা ঐতিহাসিক দলিলও বটে।

বস্তুত চাঁদ ইসলাম ধর্মের মুখ্য উপাদান। চাঁদকে কেন্দ্র করেই ইসলাম ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠান চলে। হিন্দুমতে নতুন দিনের সূত্রপাত হয় সূর্যোদয়ের মাধ্যমে। ইসলাম মতে সূর্যাস্তের পর চাঁদের অবস্থান অনুযায়ী দিন, মাস, বছরের গণনা হয়। হিন্দুরা মনে করে সূর্য হচ্ছে মহান শক্তিশালী। এই সূর্য পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস। সূর্যের জন্য জীবজগত বেঁচে রয়েছে। সূর্যপুজো হিন্দুদের অন্যতম একটি প্রচিন শ্রেষ্ঠ পুজো। সূর্যকে নিয়ে মুসমানদের ভাবনা চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত। হিন্দু ধর্মমতে চাঁদের পূর্ণ স্ফুরণ মানে পুর্নিমা। বছরের বিভিন্ন পূর্ণিমায় বিভিন্ন উৎসব হয়। আবার হিন্দুরা অমাবস্যাকেও গুরুত্ব দেয়। শক্তিপুজোর প্রকৃষ্ট তিথি হল অমাবস্যা। ইসলাম মতে আকাশে চন্দ্রকলার দৃশ্যমানের দিন থেকেই শুরু হয় মাস। চাঁদ পৃথিবীকে এবং নিজ অক্ষকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় - ঊনত্রিশ দিনের একটু বেশি। এটাকে বলা হয় চান্দ্র মাস। এরকম বারোটা মাস মিলিয়ে হয় এক চান্দ্র বছর। এই চান্দ্র বছরকে বলে হিজরী। হিজরীর দিন সংখ্যাও ৩৫৪ দিন হয়। তিনবছর ছাড়া ছাড়া এর সঙ্গে লিপইয়ারের মতো ১টি দিন যুক্ত হয়ে ৩৫৫ দিন হয়।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ কোরানকে আল্লার দান বলে উল্লেখ করে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যকেও আল্লার পবিত্র সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। পড়শী দেশের 'বাংলাদেশ খবর' — দৈনিক সংবাদপত্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করছি। এখানে চাঁদকে একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্যাখা করা হয়েছে।

জনাব মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ছিদ্দিকী — 'চাঁদ ও ইসলাম' শিরোনামে লিখেছেন — চাঁদ আল্লাহতায়ালার এক অপরূপ সৃষ্টি। এটা বিশেষ নিয়মে মানব ও অন্যান্য জীব জানোয়ারের কল্যাণার্থে আসমানের মহাশূন্যে নির্দ্বিধায় বাধা বন্ধনহীন অবস্থায় সন্তরণ করছে। বৈজ্ঞানিক মতে চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার। নিজ অক্ষরেখার চারদিকে চাঁদের আবর্তনকাল এবং পৃথিবীর চারদিকে এর পরিক্রমণ কাল

একই। এই কারণেই পৃথিবী থেকে চাঁদের কেবল একটি পিঠ-ই দেখা যায়। অপর পিঠ কখনোই দেখা যায় না। চাঁদের বুকে বেশ কিছু সমভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং বিরাট বিরাট গর্ত রয়েছে। যে পরিমাণ সূর্যের আলো চাঁদের পিঠে পড়ে তার মাত্র শতকরা ৭ ভাগ প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে সূর্যের আকর্ষণের চেয়ে চাঁদের আকর্ষণ সোয়া দুই গুণ বেশি। চাঁদের এই আকর্ষণ শক্তি স্থলভাগের কেন্দ্রস্থল ও ভূপৃষ্ঠের জলরাশির ওপর কার্যকর।

চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো বা জ্যোতি নেই। সূর্যের আলো গ্রহণ করে চাঁদ আলোকিত হয় - এই মহান সত্যটি আল কোরানই সর্বপ্রথম মানব মন্ডলীর সামনে তুলে ধরেন। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে পবিত্র আল-কোরানে বলেন - 'তিনি সূর্যকে প্রজ্জ্বলিত ও চাঁদকে আলোকিত করে সৃষ্টি করেছেন।' চাঁদ ও সূর্য যে নিজ কক্ষপথে ঘুরছে সেটিরও উল্লেখ রয়েছে কোরানে (কিন্তু বিজ্ঞান বলে সূর্য স্থির - লেখক)। কোরানের ভাষায় সূর্য হলো 'দিয়া' অর্থাৎ 'বাতি' বা জ্বলন্ত প্রদীপ - সেখানে আগুন আছে। আর চাঁদ হচ্ছে 'নূর' বা 'শুধু আলো'। পবিত্র কোরানে চাঁদকে মানুষের কর্মকান্ড ও হজের তারিখ ও সময় নির্ধারনের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।'

জনাব জাকির হোসেন — 'চাঁদ ও কুরআন' গ্রন্থে কোরানের বিভিন্ন সুরা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহতায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চাঁদকে চালান, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। ..... আল্লাহতায়ালই রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকেই মহাকাশের কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। ..... আল্লাহ চাঁদকে জ্যোতি বানিয়েছেন এবং সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল চেরাগের মত।'

পূর্বের আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় ইসলাম বা আরবী মতে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যেকার সময়সীমার গুরুত্ব অপরিসীম। চাঁদ নিজের অক্ষপথে এবং পৃথিবীর দিকে একবার পরিক্রমণ করার সময়সীমা হল এক মাস। এটিকে বলা হয় চান্দ্র মাস। এরকম ১২টি চান্দ্র মাসের সমষ্টি হল এক চান্দ্র বছর যাকে বলা হয় হিজরী। এক চান্দ্রমাস হল ২৯.৫৩০৫৮৮ দিন। এক বছর হল ৩৫৪ দিন। প্রতি তিনটি হিজরী মাসে একটি করে দিন যুক্ত হয়ে তৃতীয় হিজরী মাস হয় ৩৫৫ দিন। আধুনিক বিশ্বের বেশির ভাগ ক্যালেণ্ডার গ্রেগরি প্রচলিত ক্যালেন্ডার। যেখানে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করার সময়সীমা ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টাতে সৌর বছর হিসেবে ধরা হয়। গ্রেগরি প্রচলিত ক্যালেন্ডারে প্রতি চার বছর একটি অতিরিক্ত দিন যুক্ত হয়। সেটা লিপ ইয়ার। লিপ ইয়ারে দিন সংখ্যা ৩৬৬ দিন।

সারা বিশ্বে মুসলমানদের বেশির ভাগই হিজরী ক্যালেন্ডার মেনে চলেন বিভিন্ন পরবের সময়কাল নির্ধারণের জন্য। পাঠকদের পরিচয় করানোর জন্য সংক্ষেপে হিজরী মাসগুলোর উল্লেখ ও এর গুরুত্ব বর্ণনার চেষ্টা থাকবে।

(টীকা - ১ ঃ পরের পাতায় দেওয়া আছে)

ভারতবর্ষে মোগল শাসন শুরু হবার পর আরবী ক্যালেন্ডার বা হিজরী বর্ষ চালু হয়। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে সরকারী ভাবে হিজরী বর্ষ চালু হয় এবং সমস্ত নবাবী কাজ এই ক্যালেন্ডার মেনে চলতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ অবধি এই পদ্ধতি চলে (সূত্র ঃ Prof. Hasan Abdul Quayyum Fram Hirji to Barga Calender, Daily Sun newspaper, Dhaka 13/04/2019) হিজরী বর্ষ নিখুঁত ভাবে ইসলামী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিনগুলো ঘোষণা করে। কোন অনুষ্ঠান কোন মাসের কত তারিখে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তবে এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল ঋতুর মাপকাঠিতে একে ধরে রাখা যায় না। তাই একই মাস কখনো প্রখর গ্রীষ্মে শুরু হয় আবার কয়েক বছর পর দেখা যাবে সেই মাসটিই পড়ল প্রবল শীতের মধ্যে। শাসকদের খাজনা আদায়ের মাসে দেখা গেল শাসনের নাম গন্ধ নেই। কারণ সেটা ফসল ফলনের সময়ই নয়। সম্রাট আকবর এই সমস্যার সমাধানের জন্য চান্দ্রবর্ষ হিজরীর সঙ্গে সৌরবর্ষ খ্রীষ্টাব্দের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইলেন। মোগল আমলে হিজরী ক্যালেন্ডারকে বলা হতো তারিখ-ই-ইলাহী। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মাসের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটা ' .. ক্যালেন্ডার' তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সম্রাট আকবর ইরানের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমীর ফতুল্লাহ শিরজীকে চান্দ্র বছর ও সৌর বছর মিলিয়ে এক নতুন ক্যালেন্ডার তৈরীর জন্য নিযুক্ত

ইসলামী বর্ষপঞ্জী ঃ সূত্র উইকিপিডিয়া **টীকা - ১**

ক্রম	মাস	দিন	অর্থ	গুরুত্ব
০১.	মহরম	৩০	নিষিদ্ধ	এই মাস হিজরী বছরের প্রথম মাস। এটি পবিত্র মাস। এই মাসে বিবাহ বা শুভকাজ নিষিদ্ধ। যুদ্ধ নিষিদ্ধ। এ মাসের দশ তারিখ আশুরা বা শোক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। শোক শোভাযাত্রা, তাজিয়া বের হয়। লাঠি খেলা হয়।
০২.	সফর	২৯	রিক্ত, শূন্য	প্রাক ইসলামিক যুগে আরবের ঘর, বাড়ি এই সময় খালি বা শূণ্য থাকতো। মানুষ খাবারের খোঁজে দূর দূরান্তে যেতো। অন্যমতে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে খাদ্য ও সম্পদ লুট করার মাস এটি।
০৩.	রবিউল আউয়াল	৩০	প্রথম বসন্ত	এই মাসের ১২ তারিখে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ-মিলাদ-উন-নবি। বিরাট শোভাযাত্রা ও জলসা হয়। এছাড়া গবাদি পশু চারণের মাস ছিল শুরুতে।
০৪.	রবিউস সানি	২৯	দ্বিতীয় বসন্ত	—
০৫.	জমাদিউল আউয়াল	৩০	প্রথম শুকনো ভূখন্ড	জমে খাওয়া মাস বোঝায়। প্রথমে ছিল শীতকাল। ১১ই নভেম্বর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে এই মাসের প্রথম দিন ছিল। এ দিনেই শুরু হয়েছিল আরবী ক্যালেন্ডার বা হিজরী।
০৬.	জমাদিউস সানি	২৯	দ্বিতীয় শুকনো ভূখন্ড	—
০৭.	রজব	৩০	শ্রদ্ধা ও সম্মান/ সরিয়ে নেওয়া	এটি ইসলাম বছরের দ্বিতীয় মাস যেখানে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বর্শার ফলা খুলে তুলে রাখা হতো। ৬২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে রজব মহম্মদ আল্লাহ তালার দর্শন পান এবং ঈশ্বরীয় ক্ষমতা লাভ করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিনে 'সব-ই-মিরাজ' পালন করা হয়।
০৮.	শাবান /সাবান	২৯	বিক্ষিপ্ত	এটা শুরুতে জলকষ্টের মাস ছিল। এই মাসের ১৫ তম দিনে 'শবে-বরাত' পরব হয়। মসজিদ ও কবরস্থানে গিয়ে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে ধূপ-দীপ দেওয়া হয় সারা রাত ধরে। বাজি ফাটানো ও একে অন্যের বাড়িতে মিষ্টান্ন বিতরণ এই পরবের এক অঙ্গ। সর্বশেষ মিয়া ইমাম মহম্মদ আল মাহদীর জন্মদিন এই মাসে।
০৯.	রমজান /রামাদান	৩০	দহন বা রোদে পুড়ে যাওয়া	এটি মুসলমানদের কৃচ্ছতা সাধনের মাস। উপবাস বা রোজার সাহায্যে শরীরের দহন ও পার্থিব চাহিদা, লালসা দগ্ধ হয়। এই মাসে বিবাহ নিষেধ। ইসলামে সবচেয়ে পবিত্র মাস। একমাস রমজান শেষে চাঁদের দেখা পেলে হয় পবিত্র খুশির ঈদ-উল-ফিতর।
১০.	শওয়াল	২৯	উথ্থিত	—
১১.	জ্বিলকদ	৩০	সাময়িক যুদ্ধ বিরতি	এই মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ তবে আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা বৈধ।
১২.	জেলহজ্জ / জ্বিলহজ্জ	২৯/৩০	হজের মাস	এই মাসের ৮-১৩ তারিখের মধ্যে মক্কায় কাবার উদ্দেশ্যে হজ করতে যান। ঈদ-উল-আজহা বা বখরি ঈদ এ মাসের ১০ তারিখে শুরু হয় এবং ১২ তারিখে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়। এই মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। হিজরী বছরের প্রতি তিনবছর অন্তর যে একটি অতিরিক্ত দিন আসে সেটি এমাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ এই মাসের দিন সংখ্যা ২৯। কিন্তু তিনবছর পর এই মাসের দিন সংখ্যা হয় ৩০।

করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৯৬৩ হিজরীর প্রথম মাস মহরমের প্রথম দিন ৯৬৩ অব্দের সূচনা করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। এই দিন থেকে বঙ্গাব্দ নামে নতুন বাংলা বছরের সূচনা করেন। যদিও এটি চালু হয়েছিল ১৫৮৪ সালের ১১ই মার্চ। এই দিনটিকে ১লা বৈশাখ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আকবর বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের স্রস্টার স্বীকৃতি পেলেও অন্য কয়েকটি সূত্র অন্য কথা বলছে। সপ্তম শতকে শশাঙ্কের রাজত্বকালে দুটি প্রাচীন শিবমন্দিরের লিপিতে বঙ্গাব্দ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন। আবার ঐতিহাসিক নীতিশ সেনগুপ্তের মতে আকবরের রাজত্বকালের দুশো বছর আগে কয়েকটি শিবমন্দিরে বঙ্গাব্দ লেখা লিপি উদ্ধার হয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী বাংলায় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ চান্দ্রমাস ও সৌরমাসকে মিলিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরী করেন। পুরোনো সময়েই এই সব ক্যালেন্ডারে ৩০ দিনের আলাদা আলাদা নাম ছিল। এতে ব্যবহারিক কাজে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। সৌর ক্যালেন্ডারে ইতিমধ্যে মাসকে ভেঙে সপ্তাহ করা হয়েছে। সম্রাট শাহজাহান একজন বিশিষ্ট পর্তুগীজ পন্ডিতের সাহায্যে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ন্যায় সপ্তাহের প্রচলন করেন। সাতদিনের আলাদা আলাদা নাম দেন গ্রহ নক্ষত্রে নাম অনুযায়ী। এই প্রথম মানুষ কোনো ধর্মীয় গন্ডীর বাইরে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান মেনে অসাম্প্রদায়িক দিন নাম পেল।

ক্রম	গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে দিনের নাম	বাংলা/ভারতীয় নাম	নক্ষত্র/গ্রহের নাম
০১.	Sunday	রবিবার	SUN (সূর্য) - নক্ষত্র
০২.	Monday	সোমবার	MOON (চন্দ্র) উপগ্রহ
০৩.	Tuesday	মঙ্গলবার	MARS (মঙ্গল) গ্রহ
০৪.	Wednesday	বুধবার	MERCURY (বুধ) গ্রহ
০৫.	Thusday	বৃহস্পতিবার	JUPITER (বৃহস্পতি) গ্রহ
০৬.	Friday	শুক্রবার	VENUS (শুক্র) গ্রহ
০৭.	Saturday	শনিবার	SATURN (শনি) গ্রহ

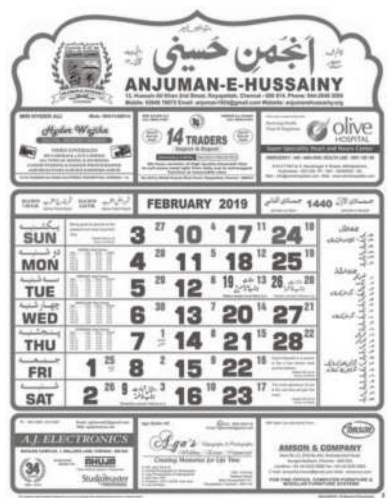

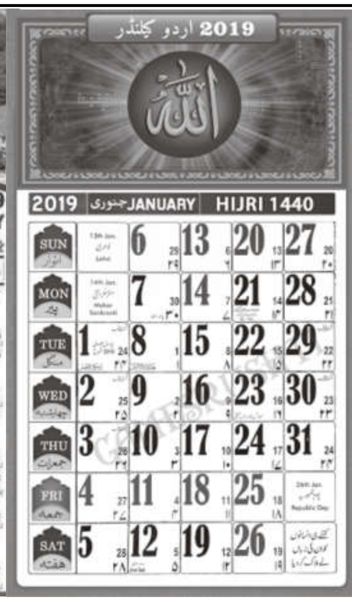

পরবর্তীকালে ভারতীয় মাসগুলোও এসেছে বিভিন্ন নক্ষত্রের নাম অনুসারে । একমাত্র অগ্রহায়ণ ছাড়া

ক্রম	ভারতীয় মাস	নক্ষত্র
০১.	বৈশাখ	বিশাখা
০২.	জৈষ্ঠ্য	জেষ্টা
০৩.	আষাঢ়	আষাঢ়
০৪.	শ্রাবণ	শ্রবণা
০৫.	ভাদ্র	ভাদ্রপদ
০৬.	আশ্বিন	অশ্বনী অশ্বনী
০৭.	কার্ত্তিক	কৃত্তিকা
০৮.	অগ্রহায়ণ	— অগ্র - প্রথম ও হায়ণ - ধান (খাজনা আদায়ের মাস)
০৯.	পৌষ	পুষ্যা
১০.	মাঘ	মঘা
১১.	ফাল্গুন	ফাল্গুনী
১২.	চৈত্র	চিত্রা

এই বছর গ্রেগরিয়ান বা সৌরবছর হিসেবে ২০১৯। বঙ্গাব্দ ১৪২৬। হিজরী সন ১৪৪১। পড়শী বাংলাদেশের জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ মুসলমান। সেখানে হিজরী ক্যালেন্ডার নয় সরকারী ভাবে চালু বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ। ১৯৮০ সাল থেকে সেখানে সমস্ত সরকারী কাজ বাংলায় হওয়ায় বঙ্গাব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতে খাজনা নেওয়া হয় বঙ্গাব্দ ক্যালেন্ডার মেনে। কিন্তু সমস্ত সরকারী কাজকর্ম হয় গ্রেগরিয়ান বা ইংরেজী ক্যালেন্ডার নিরিখে। পুজো-পার্বন, বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশনের মতো সামাজিক কাজে অবস্য বাংলা ক্যালেন্ডার ও পাঁজির প্রয়োজন পড়ে। উভয় বাংলায় হালখাতার দিন হিসেবে ১লা বৈশাখ ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮৯ সাল থেকে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রা বেরোয়। শরিয়ত পন্থী হিজরীসনের প্রবক্তরা এই শোভাযাত্রাকে বানচান করার চেষ্টা করলেও ভাষার স্বাধীকারের দাবীতে এই শোভাযাত্রা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১লা বৈশাখ কলকাতায়ও বাংলাভাষার প্রতি সম্মান জানাতে মঙ্গল শোভা যাত্রা বেরোচ্ছে কয়েকবছর ধরে। তাই আজ ভাষাগত স্বাধীকারের প্রশ্নে হিজরীর উপরে স্থান করে নিয়েছে বঙ্গাব্দ।

চলুন চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করি

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

কত কি ঘটে চলে আকাশে নিখুঁত নিময়কানুন মেনে। সূর্য, চন্দ্র, তারা, ধূমকেতু, উল্কাপাত, গ্রহণ, গ্রহ, উপগ্রহ, তাদের সংক্রমণ এমন আরও কত কি। এসবের খবর কে আর রাখে, আমরা আমাদের নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কিছু বলতে গেলে আপনারাই প্রশ্ন করেন — এসব দেখে, জেনে কি লাভ, ওরা ওদের মত চলুক না। সত্যি বলতে কি, নিয়মিত আকাশ পর্যবেক্ষণ আর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করলে আপনি তা থেকে অবশ্যই শিখবেন শৃঙ্খলাবোধ। আর ঐ আকাশের সীমাহীন ব্যাপ্তি আপনাকে উদার হতে শেখাবে। ফলে হানাহানি, মারামারি আপনার সুপ্ত মানসিকতা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। আজকের পৃথিবীর মানুষের কাছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কী ? আকাশচর্চায় লাভ হল তো ?

চাঁদের কথা ঃ

আসুন, আজ আমরা আকাশের চাঁদ পর্যবেক্ষণে যাই। একমাস ধরে দেখবো প্রতিদিন। তবে তার আগে চাঁদ সম্বন্ধে দু-চারটি তথ্য দিয়ে দিই। আকাশে সূর্যের পর চাঁদই হল সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যদিও সূর্যের নিজের আলো আছে চাঁদের নেই। চাঁদ সূর্যের আলোতেই আলোকিত। চাঁদ আমাদের একমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহ, প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর বয়স তার।

প্রথমে চাঁদের দশার (Phase) কথা বলি। দেখবেন, অমাবস্যায় চাঁদের দেখা নেই আকাশে। তারপর প্রতিদিন একটু একটু করে চাঁদ তার আলোকিত অংশের বৃদ্ধি ঘটায় এবং ১৪দিন পরে চাঁদ সম্পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়, একে বলি পূর্ণিমা। আর এই যে একটু একটু করে আলোকিত অংশ বাড়ছে একে বলি Waxing of the moon। এই সময়টা হল শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার পর চাঁদের আলোকিত অংশ এবার কমার পালা। একটু একটু করে কমতে কমতে (একে বলি Waning of the moon) আরও ১৪ দিন পর চাঁদকে আর দেখা যাবে না — অমাবস্যা; এই সময়টাকে বলি কৃষ্ণপক্ষ। এই দুটি অবস্থা মিল হল চাঁদের একটি সম্পূর্ণ চক্র (Cycle)।

আসুন, চাঁদের এই দশা (Phase) বুঝতে আপনি বাড়িতে বসে একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্য নিতে পারেন। আপনি একটি অন্ধকার ঘরে একটিই মাত্র ইলেক্ট্রিক বাল্ব জ্বালুন আর সেখান থেকে প্রায় ৬ বা ৭ ফুট দূরে দাঁড়ান। আপনার হাতে টেনিস বলের মত কিছু একটা ধরুন। হাতটা বল সমেত প্রসারিত করুন। এই পরীক্ষায় বাল্বটি সূর্য, হাতের বলটি চাঁদ এবং আপনার মাথাটি পৃথিবী। এবার আপনি বলসমেত আপনার হাতটি আপনার মাথার চারদিকে ঘোরান, অর্থাৎ পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ ঘুরছে। মনে রাখতে হবে, কোনভাবে বাল্বটা বল দ্বারা চাপা পড়ে না যায় (দেখার ক্ষেত্রে) এবং আপনার মাথার ছায়ার দ্বারা বলটা চাপা পড়ে না যায়। তাহলেই আপনি দেখবেন বাল্বের আলোর দ্বারা বলের আলোকিত অংশ কেমনভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাল্ব থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘোরানোর পর বলটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয়ে গেল — পূর্ণিমা। তারপর আরও ঘোরালে বলের আলোকিত অংশ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং আরও ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে শুরুটা যেখানে করেছিলেন, সেইখানে ফিরিয়ে আনলে দেখবেন, বলটার কোন অংশ আর আলোকিত দেখছেন না, বরং বলা ভালো বলটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। এই হল অমাবস্যা।

অর্থাৎ সূর্য যখন একই সাথে পাশাপাশি চাঁদকে নিয়ে অবস্থান করছে, তখন অমাবস্যা চলতে থাকে আর সূর্য এবং চন্দ্র যখন একে অপরের বিপরীতে অবস্থান করে তখন হয় পূর্ণিমা।

চাঁদের ঘূর্ণন এবং আবর্তন ঃ

চাঁদ যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তা আমরা সবাই জানি।

নক্ষত্রের পটভূমিকায় এমন ঘোরাকে বলি চাঁদের আবর্তন। এমন ভাবে একপাক ঘুরতে চাঁদের সময় লাগে ২৭.৩২১৭ দিন। এটি হল চাঁদের নাক্ষত্র মাস (Sidereal month)। আবার যেহেতু পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তাই চাঁদকেও পৃথিবীর লেজুড় হয়ে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে হচ্ছে, আর এই কারণেই চাঁদকে পৃথিবীর চারিদিকে একপাক ঘুরতে আরও ২ দিন বেশি সময় নিতে হচ্ছে। তার ফলেই পৃথিবীর চারিপাশে একপাক ঘুরতে চাঁদের সময় লেগে যায় ২৯.৫৩০৬ দিন। আর এইটিই চাঁদের সৌর মাস (Solar month)।

পৃথিবী থেকে চাঁদের একটি অর্ধই দেখতে পাই ঃ

এর কারণ হল চাঁদ নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে (ঘূর্ণন) যত সময় নেয়, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে (আবর্তন) ঠিক ততটাই সময় নেয়, আর এই কারণেই চাঁদের একটি পিঠই আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। আর একটা কথা বলা দরকার, চাঁদের ঘূর্ণন এবং আবর্তন ছাড়া আরও একটি গতি আছে এর নাম হল লাইব্রেশন (Libration)। চাঁদের উত্তর দিকটা এর ফলে সামনে-পিছনে দোলে আর এই জন্যই চাঁদের ৫০ শতাংশ দেখতে পাবার পরও আর ৯ শতাংশ বেশি দেখতে পাই পৃথিবী থেকে।

আসুন এইসব জেনে নিয়ে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করতে যাই।

চাঁদ পর্যবেক্ষণ ঃ

মনে করুন, যেকোনো একদিন, সেটা অমবস্যার দু'দিন পরে হলে ভালো হয়। সন্ধ্যেবেলা পশ্চিম আকাশে দেখবেন সূর্য ডুবে যাবার পর চাঁদকে দেখা যাচ্ছে, চাঁদের আলোকিত অংশটি একেবারে সরু কাস্তের মতো, পরের দিন দেখুন ও পশ্চিম দিকে — দুটি ঘটনা ঘটবে, **এক ঃ** চাঁদের আলোকিত অংশটি আগের দিনের চেয়ে খানিকটা বেড়েছে অর্থাৎ কাস্তে মোটা হয়েছে। **দুই ঃ** চাঁদ আগের দিনের চেয়ে একই সময়ে পূর্বদিকে সরে গিয়েছে প্রায় ১৩.২ ডিগ্রি নক্ষত্রদের পটভূমিকায়। তারপরের দিন চাঁদের আলোকিত অংশ আরও খানিকটা বেশি এবং চাঁদের আগের দিনের অবস্থানের চেয়ে একই সময়ে চাঁদ আরও ১৩.২ ডিগ্রি পূর্বদিকে সরে গেছে। এই পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে যাওয়াটা হল চাঁদের নিজস্বগতি। ১৪দিন পর চাঁদ একেবারে পূর্বদিকে সন্ধ্যেবেলা উঠবে পূর্ণিমা হয়ে। চাঁদের কলঙ্ক বা Crater দেখার প্রকৃষ্ট সময় হল অমাবস্যার ২-৩ দিন পর। ঐ সময় টেলিস্কোপ তাক করে দিন চাঁদের দিকে, ধরা পড়বে চাঁদের অপূর্ব গর্তগুলি, ছবি তুলে রাখুন। পূর্ণিমার সময় কিন্তু গর্তগুলি পরিস্কার বোঝা যায় না। আরও একটা কথা, যেহেতু পূর্ণিমার সময় চাঁদের ঔজ্জ্বল্য সর্বোচ্চ, তাই পূর্ণিমার চাঁদকে যখন টেলিস্কোপে দেখবেন, পারলে Moon-filter লাগিয়ে নেবেন।

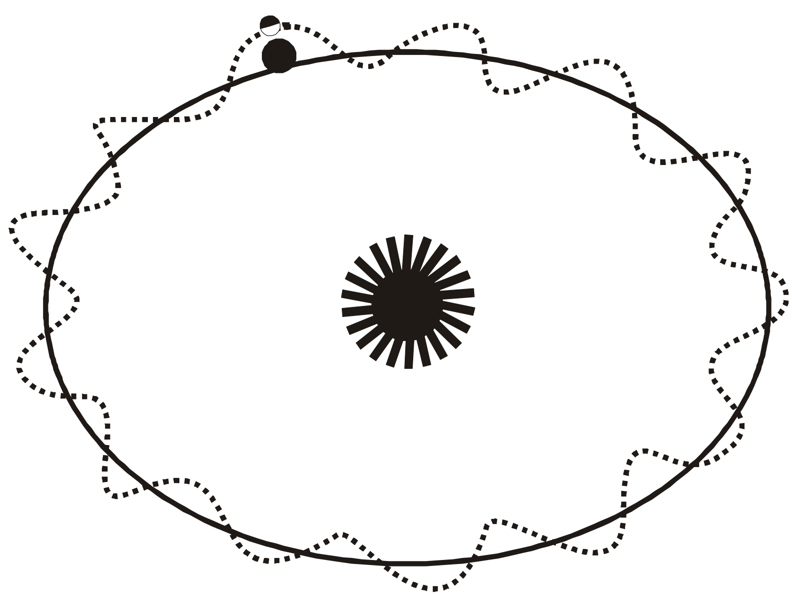

চাঁদের জমি বেচাকেনা ও এক ডজন চন্দ্রাভিযাত্রী

ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

ডেনিস হোপ দাবি করেন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। কথাটা ভুল নয়। পৃথিবী তো বটেই পৃথিবীর বাইরে যে মহাবিশ্ব আছে সেটা ধরলেও তিনি তাবৎ ব্রহ্মান্ডের ধনীতম ব্যক্তি। গাঁজা খুরি নয়। বর্ণে বর্ণে সত্য। কারণ এই ডেনিস হোপ-ই ১৯৮২ সাল থেকে লাগাতার চাঁদের জমি বিক্রি করে কোটি কোটি তস্য কোটিপতি হয়েছেন। শুধু চাঁদে নয় মঙ্গল গ্রহেও যদি আপনি জমি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে ডেনিস হোপ এর সংস্থা 'LUNARCHY'-এর সঙ্গে। টাকার বিনিময় আপনি পাবেন দামী কাগজে ছাপা আপনার জমির কেনা নক্সা এবং মালিকানার প্রমাণ পত্র।

পাগলের প্রলাপ ভাবছেন নাকি! আজ্ঞে ক্রেতার তালিকায় আছেন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, জিমি কার্টার, রোনাল্ড রেগন, আমাদের দেশের বলিউড নক্ষত্র শাহরুখ খান। ১৯৬৭ সালে কলেজে আইন পড়ার সময় হোপ খেয়াল করেন বর্হি বিশ্ব সম্পর্কে যুক্ত রাষ্ট্রের যে চুক্তি আছে সেখানে বলা আছে পৃথিবীর কোন দেশ চাঁদের মালিকানা দাবি করতে পারবে না। কিন্তু একথা বলা নেই যে ব্যক্তি মালিকানা থাকতে পারবে না। হোপ এই মর্মে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখলেন যে তিনি চাঁদের মালিক এবং এও অনুরোধ করলেন যাতে এই মালিকানার স্বপক্ষে আইনের ব্যাখাও দেওয়া হয়। যথারীতি কোন উত্তর আসেনি। অতএব কাজ শুরু হয়ে গেল। চাঁদের ৬১১ লক্ষ একর জমি চলে এল হোপ-এর হাতে। বিক্রিও শুরু হয়ে গেল। এক একর জমির দাম সাড়ে ছত্রিশ পাউন্ড। এর মধ্যে ধরা আছে 'লুনার ট্যাক্স' এবং দলিল পাঠানোর খরচ। এক লপ্তে অনেক জমি কিনলে দামে ছাড় দেবারও ব্যবস্থা আছে। একবার এই ভাবে আড়াই লক্ষ পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে ২.৬ লক্ষ একর জমি।

মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, প্লুটো এই সব গ্রহদের জমির মালিকানা নির্ধারন করে 'GALACTIC GOVT.' যার প্রেসিডেন্ট জেনিস হোপ।

এখানেই ব্যাপারটিতে ইতি নয়। হোপ-এর মত বেশ কিছু চাঁদ পাগল লোক মিলে তৈরী করে ফেলেছেন আস্ত একটা তথ্য চিত্র। সেখানে চাঁদে পা রাখা অভিযাত্রী এ্যালান বিন-এর আঁকা চন্দ্রাভিযানের ছবিও ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে মূল চরিত্র ইস্টোফার কারসান। এক ২০ বছরের ছোকরাকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে চাঁদে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে চায়। সমস্যা হল পৃথিবীর টাকা কড়ি তো চাঁদে চলবে না। সেখানের মুদ্রা কি হবে এবং তা কিভাবে ভাঙানো যাবে এই নিয়ে হোপ রীতিমত চিন্তিত। ছবির পরিচালক সাইমন এনিস বলেছেন - রাতের আকাশে চাঁদের শোভা অতুলনীয়, ছবিতে অনেক মজার উপাদান আছে। ডেনিস হোপ বুদ্ধু নন টনটনে জ্ঞান আছে তার। আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে দিনের পর দিন দরবার করেছেন কী করে চাঁদের মুদ্রাকে পৃথিবীর মুদ্রার সঙ্গে ব্যবহার উপযোগী করা যায় তার উপায় জানার জন্য। হোপ এটাও জানেন চাঁদে প্রচুর হিলিয়াম আছে। যারা চাঁদের জমি কিনছেন তার ঐ হিলিয়াম বিক্রি করেই কোটিপতি হয়ে যাবেন। হোপ এর বক্তব্য খুব স্পষ্ট যে কোন দেশ ইচ্ছে করলেই চাঁদে অভিযান করতে পারে কিন্তু তার সংস্থার কেনা জমিতে হাত দেওয়া যাবে না। লুনার ছবিটি তাবড় তাবড় চলচিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে। এমনকি টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার ছবি দেখানোর পর জমি বিক্রির পরিমাণ বেড়ে গেছে।

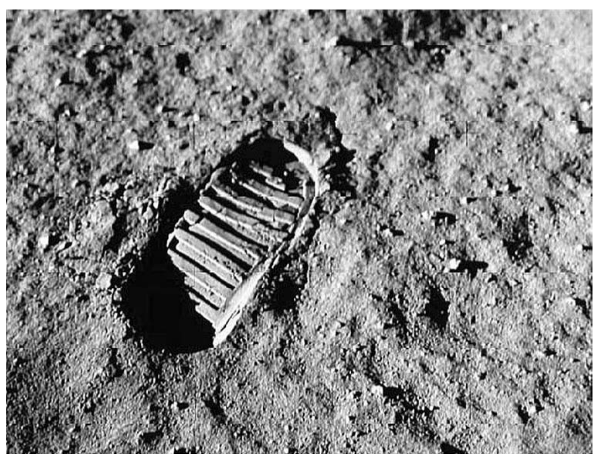

ব্যাপার গুরুতর দেখে National Geographic-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইন সংস্থাকে একটি চিঠি লিখে ব্যাপারটি অবহিত করা হয়। চিঠির উত্তরে ঐ সংস্থার প্রেসিডেন্ট তানজা ম্যাসন লিখিত ভাবে জানান হোপের দাবি পাগলের প্রলাপ মাত্র কারণ কোন দেশ চাঁদের মালিকানা না পাওয়ার অর্থ এই নয়

যে চাঁদ ব্যক্তি মালিকানার অধীনে থাকতে পারে। কারণ ব্যক্তি তো দেশেরই অঙ্গ। ব্যাপার যাই হোক হোপের ব্যবসা কিন্তু এখনও চলছে।

দ্বাদশ চন্দ্রাভিযাত্রী ঃ

নীল আর্মস্ট্রং

১৯৬৯-৭২ এই সময়কালের মধ্যে এক ডজন মানুষের পদার্পণ ঘটেছে চাঁদে। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী **নীল আর্মস্ট্রং**। ২০ জুলাই ১৯৬৯ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এবং মানুষের চাঁদে অভিযানের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিন। আর্মস্ট্রং-এর এই পদচিহ্নের ছবি সম্বলিত একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল নাসা। কিন্তু সেটি স্মারক হিসেবেই সংরক্ষিত, বাজারে চালু নয়। আর্মস্ট্রং বলেছিলেন "That's one small step for man, one giant leap for mankind"। অ্যাপেলো-১১ অভিযানের পরেও বহু বছর বেঁচেছিলেন আর্মস্ট্রং। ২০১২ সালে ৮২ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

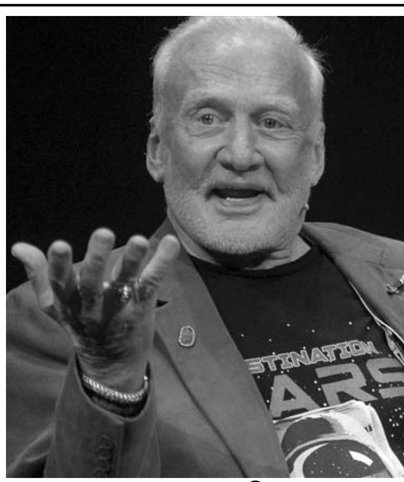

বাজ অলড্রিন

বাজ অলড্রিন-এর চাঁদে প্রথম ছবিটি আর্মস্ট্রং-এর তোলা। যেটি সকলেই দেখেছেন। অভিযানের পরেও অলড্রিন থেমে থাকেন নি। এখনও নানা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর-এ ৮৯ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণমেরু গিয়ে ছিলেন। অসুস্থতার জন্য তাঁকে ফেরৎ আসতে হয়।

চার্লস পিটার কনরাড অ্যালান বিন

অ্যালান বিন ও চার্লস কনরাড দুজনেই ১৯৬৯ নভেম্বরে অ্যাপেলো ১২ চেপে চাঁদে যান। অভিযানের পর যে ছবিটি প্রকাশ হয় তাতে দেখা যায় বিন চাঁদের মাটি সংগ্রহ করছেন আর তাঁর হেলমেটে ছায়া পড়েছে কনরাডের। বিন ১৯৮১ সালের জুন মাসে নাসা থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবন চিত্রকর হিসেবে কাটিয়ে দেন। ২০১৮ সালের ২৬ মে ৮৬ বছর বয়সে বেড়াতে গিয়ে বিন এর মৃত্যু হয়।

কনরাড মারা যান ১৯৯৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ওজাই শহরে। বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

এ্যালান শেফার্ড (মাঝে) ও এডগার মিচেল (ডানদিকে)

এডগার মিচেল ও এ্যালান শেফার্ড দু'জনে অ্যাপেলো ১৪ অভিযানে অংশ নিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালে চাঁদে অবতরণ করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্টুয়ার্ড রোসা। মিচেল ২০১৬ সালে ৮৫ বছর বয়সে ফ্লোরিডা শহরে মারা যান। শেফার্ড মারা যান ১৯৮৮ সালে।

জেমস আরউইন ডেভিড স্কট

এ্যাপেলো ১৫-র অভিযানে যাত্রী ছিলেন **জেমস আরউইন এবং ডেভিড স্কট** । আরউইন ৭২ সালের জুলাই মাসে নাসা থেকে পদত্যাগ করে কলোরাডো শহরে নিজের ধর্মীয় সংস্থা তৈরী করেন। ১৯৯১ সালে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। স্কট যে ঘড়িটি পড়ে চাঁদে নামেন সেটি ২০১৫ সালে ১.৫ লক্ষ পাউন্ডে বিক্রি হয়। তিনি ৮৭ বছর বয়সে এখনও জীবিত।

জন ইয়ং (মাঝে) ও চার্লস ডিউক (ডানদিকে)

২১ এপ্রিল ১৯৭২ সালে অ্যাপেলো ১৬ অভিযানে **চার্লস ডিউক ও জন ইয়ং** দুই অভিযাত্রী চাঁদে অবতরণ করেন। ডিউক মাত্র ৩৬ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ অভিযাত্রী হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে নাসা থেকে অবসর নিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করেন। এখন তাঁর বয়স ৮৩।

ইউজিন কারনান হ্যারিসন স্মিডত

জন ইয়ং ৬ বার মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন, ৮৭ বছর বয়সে হাউসটন এর নিজের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। দিনটি ৫ই জানুয়ারী ২০১৮।

অ্যাপেলো ১৭-র অভিযাত্রী ছিলেন **হ্যারিসন স্মিডত এবং ইউজিন কারনান**। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২-এর অভিযানে স্মিডত ছিলেন বিজ্ঞানী এখন তাঁর বয়স ৮৪। এই অভিযানে কমান্ডার ছিলেন কারনান। ৮২ বছর বয়সে ১৩ই জানুয়ারী ২০১৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গরুর গাড়ির চাকায় চেপে চাঁদের দেশে

জহর চট্টোপাধ্যায়

২০১৯ সালটা চন্দ্রময়। চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পা দেওয়ার অর্দ্ধশতবর্ষপূর্তির সঙ্গে ভারতের চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপন। মানুষ প্রথম যে মহাজাগতিক বস্তুটিকে চেনে সেটি চাঁদ। ছেলেবেলায় মা তার শিশুকে চাঁদ দেখতে শেখায়। ব্যাকরণের বইতে আজও তাই প্রযোজ্য কর্তা আর প্রযোজক কর্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে রায়েছে ‘মা শিশুকে চাঁদ দেখাইতেছেন’ বাক্যটি। তাই চাঁদের প্রতি সকলেরই আশৈশবের ভালোবাসা। ‘ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র’-এর চন্দ্রযান-২ আবার চাঁদকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। ‘ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র’ বা চলতি কথায় ‘ইসরো’ যে সময় এবং যেভাবে মহাকাশ গবেষণা শুরু করেছিল তা ছিল অসম্ভবকে সম্ভব করার এক অমানুষিক প্রয়াস। এর নেতৃত্বে ছিলেন ভারতের মহান বিজ্ঞানীরা। যাঁদের অন্যতম হোমি ভাবা, বিক্রম সারাভাই, এ.পি.জে. আব্দুল কালাম। সদর্থেই গরুর গাড়ির চাকায় চেপে এই জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।

ইসরোর প্রাক্তন প্রধান আরাভামুদন (গেঞ্জি গায়ে) এবং এ.পি.জে. আব্দুল কালাম রকেটের

আধুনিক ভারতের মহাকাশ গবেষণার সূত্রপাত ঘটে ১৯২০ সালে, যখন বিজ্ঞানী শিশির কুমার মিত্র কলকাতায় আয়নোস্ফিয়ারে তরঙ্গ পাঠানোর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন এবং মেঘনাদ সাহা মহাকাশ গবেষণার সাথে যুক্ত হন। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি শুরু হয় ১৯৪৫ সালে যখন ডঃ বিক্রম সারাভাই আমেদাবাদে ‘ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটারি’ এবং ডঃ হোমি ভাবা মুম্বাইয়ে ‘টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ’ নামে দুটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার হোমি ভাবা’র নেতৃত্বে ‘পারমাণবিক শক্তি বিভাগ’ গঠন করে। এই সংস্থা সারা ভারতে সমস্ত মহাকাশ গবেষণার কাজে আর্থিক সাহায্য করতে থাকে। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া স্পুৎনিক-১ উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে পৃথিবীর সব দেশের সামনে মহাকাশ গবেষণার এক নতুন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেয়। ফলে ১৯৬০-এর দশকে ভারতের মহাকাশ গবেষণা গতি পায়। সে সময়ে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরীও গবেষণার পর্যায়ে। ১৯৬২ সালে ডঃ সারাভাই ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ’ নামে একটি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা গঠন করেন। এরপর আমেরিকা যখন ‘সিনকম-৩’ উপগ্রহের মাধ্যমে ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের খেলা জাপান থেকে সরাসরি আমেরিকায় সম্প্রচার করে তখন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার পথিকৃত ডঃ বিক্রম সারাভাই ভারতের উন্নতিতে যোগাযোগ উপগ্রহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহাকাশ গবেষণায় গতি সঞ্চার করেন। ভারতের বিজ্ঞানীরা লেগে পড়লেন নিজস্ব প্রযুক্তিতে যোগাযোগ উপগ্রহ তৈরী করে মহাকাশে পাঠানোর কাজে। উপগ্রহ পাঠানোর জন্য দরকার রকেট। তবে নিজস্ব প্রযুক্তিতে রকেট বানিয়ে সেটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করার কাজ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তার অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকেই চলছিল রকেট বানানো এবং তা আকাশে পাঠানোর কাজ।

কেরালার তিরুবনন্তপুরম শহরের কাছে থুম্বা নামে একটি জেলেদের গ্রামকে এই কাজের জন্য বাছা হ’ল। প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ সেই গ্রামটির একদিকে রেললাইন আর অন্যদিকে সমুদ্র। তার প্রায় ৬০০ একর জমিকে গবেষণার মূল কাজের জন্য বেছে নেওয়া হল। ওই জমির মধ্যে ছিল একটি পুরোনো চার্চ। ওই চার্চটি ছাড়া আশেপাশে আর কোনো পাকা বাড়ি ছিল না। তাই চার্চটিকেই গবেষণা কেন্দ্র করা ছাড়া অন্য

উপায় ছিল না। বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনের কথা ভেবে ডঃ সারাভাই ওই চার্চের বিশপ রেভারেণ্ড পিটার বার্নাড পেরেইরার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জানান মহাকাশ গবেষণার জন্য রকেট উৎক্ষেপণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের কেন্দ্র হিসাবে চার্চটি ব্যবহার করতে চান। বিশপ স্বেচ্ছায় 'সেন্ট মারী মাগ্দালান' চার্চটি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র করার জন্য ছেড়ে দেন। এই চার্চটিই থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের প্রথম অফিস। চার্চের প্রার্থনাসভাঘরটিকে গবেষণাগার এবং বিশপের ঘরটিকে নকশা তৈরীর কাজে লাগানো হ'ল। অফিসে আসবাব বলতে একটা কাঠের টেবিল আর একটা চেয়ার। সেখানে কাজ শুরু করলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং 'মিশাইল ম্যান' নামে পরিচিত এ.পি.জে. আব্দুল কালাম। কালাম তাঁর আত্মজীবনী 'উইংস অফ ফায়ার' গ্রন্থে এই সময়ের কথা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর থুম্বা থেকে ভারতের প্রথম রকেটটি মহাকাশে পাড়ি দেয়। 'নাইকি-অ্যাপাচে' নামে এই রকেটটির যন্ত্রাংশ তৈরী করেছিল 'নাসা'। বিজ্ঞানীরা সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে যন্ত্রাংশ গুলি নিয়ে এসেছিলেন। ইন্টারনেটের দৌলতে সেই ছবি আজ সকলেরই পরিচিত। রকেটের টুকরোগুলো চার্চের লম্বা বেদির সামনের মেঝেতে জোড়া লাগানো হয়। চার্চের

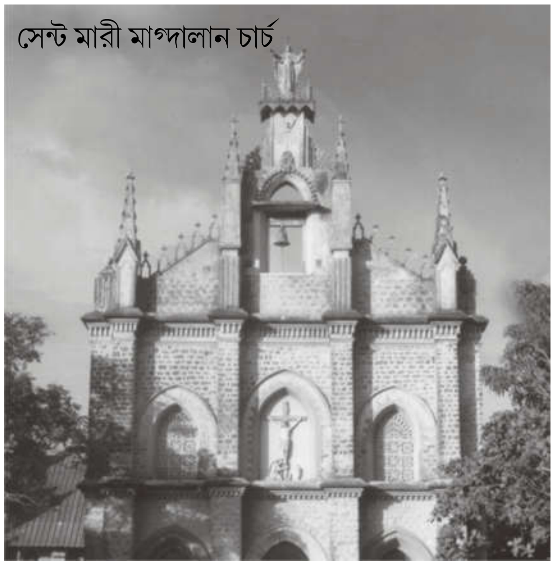
সেন্ট মারী মাগ্দালান চার্চ

সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে রকেটের যন্ত্রাংশ গুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দাদের বিজ্ঞানীরা কথা দিয়েছিলেন যে চার্চের পবিত্রতা তাঁরা অক্ষুন্ন রাখবেন তাই মারী'র মুর্তি ও পূজার বেদীর আশপাশকে ছেড়ে রেখেই কাজ করতেন। চার্চে জোড়া লাগাবার পর ট্রাকে করে রকেটকে উৎক্ষেপনের যায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ত। তবে সবসময় যে ট্রাক পাওয়া যেত এমন নয়। ১৯৮০ সালে 'রোহিনী' নামে একটি পরীক্ষামূলক যোগাযোগ উপগ্রহ তৈরীর পর থুম্বার রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। আসলে উপগ্রহটিকে লোহা ব্য অন্য কোন ধাতুর সংস্পর্শে আনা নিষেধ ছিল, তাই সহজলভ্য গরুর গাড়িতে চাপিয়েই তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এমন হাজারো অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারতের মহাকাশ গবেষণা আজ যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তা প্রতিটি ভারতবাসীর কাছেই অত্যন্ত গর্বের। ১৯৬৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ' সংস্থা নাম বদলে 'ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' বা 'ইসরো' হয়। প্রথমে সংস্থাটি ভারত সরকারের 'পারমাণবিক শক্তি বিভাগ' মন্ত্রকের অধীনে ছিল, পরে ১৯৭২ সালে 'মহাকাশ বিভাগ' নামে একটি পৃথক মন্ত্রক তৈরী করে তার অধীনে 'ইসরো'-কে নিয়ে আসা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল রাশিয়ার উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে 'ইসরো'র তৈরী ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'-কে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। ১৯৮০

সালে 'ইসরো' নিজের তৈরী 'স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল' বা 'এস.এল.ভি.' রকেটে করে প্রথম যে উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করল তার নাম 'রোহিনী'। এই সফল উৎক্ষেপণ ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। 'এস.এল.ভি.' রকেটের পর ক্রমশ আরো শক্তিশালী 'পি.এস.এল.ভি.' , 'জি.এস.এল.ভি.' এবং 'ম্যাক-থ্রি' রকেট 'ইসরো' বানিয়েছে। সফলভাবে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর প্রথমবার চাঁদে পাড়ি দেয় 'ইসরো'র তৈরী 'চন্দ্রযান-১'। প্রথম চেষ্টাতেই সফল 'ইসরো'। চাঁদের মাটিতে আছড়ে পরার সময় 'চন্দ্রযান-১' যে ছবি পাঠালো তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বিশ্বকে জানালেন চাঁদের মাটিতে জল আছে এবং তা আছে বরফের আকারে। চাঁদের মাটিতে জলের সম্ভাবনার কথা বহুবার শোনা গেলেও প্রমাণ পাওয়া গেল এই প্রথমবার।

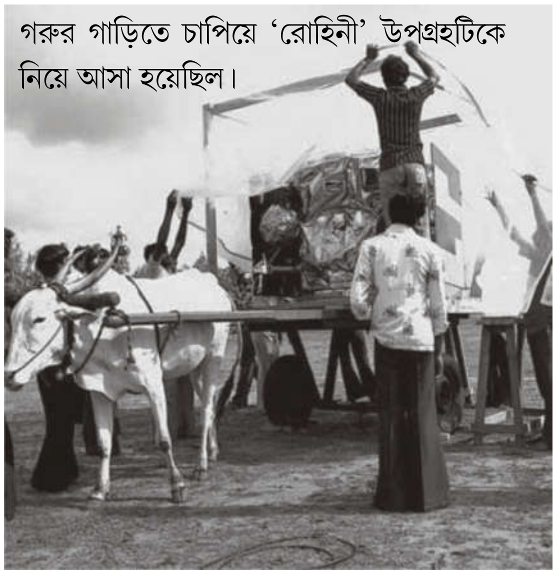

গরুর গাড়িতে চাপিয়ে 'রোহিনী' উপগ্রহটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

'ইসরো' এই সাফল্য পেয়ে ঘোষণা করল তার 'চন্দ্রযান-২' প্রকল্পের। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর পৃথিবীর চতুর্থ এবং এশিয়ার প্রথম দেশ হিসাবে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে 'ইসরো' পাঠাল 'মঙ্গলযান'। ২০১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 'মঙ্গলযান' মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে ভারতকে প্রথমবারের চেষ্টাতেই মঙ্গলে পৌঁছানো পৃথিবীর প্রথম দেশের সম্মান এনে দেয়। 'ইসরো'র বিজ্ঞানীদের জন্যই এই সম্মান। ২০১৬ সালে একটি রকেটের সাহায্যে একসাথে ২০ টি উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করার পর ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'ইসরো' একটি রকেটের সাহায্যে একসাথে ১০৪ টি উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করে। এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। ২০১৭ সালেই ৫ জুন 'ইসরো' তার রকেটের শক্তি বাড়িয়ে ৪-টন ওজনের উপগ্রহ বহন করার ক্ষমতা অর্জন করে। ২০১৯ সালে মানে এবছর আবার চাঁদে পাড়ি দেওয়ার পালা। ১৪ জুলাই 'চন্দ্রযান-২' যাত্রা শুরু করার কথা থাকলেও কিছু ত্রুটির জন্য শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে যায়। পুনরায় ত্রুটি সারিয়ে ২২ জুলাই চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় 'চন্দ্রযান-২'। ২০ অগাস্ট চাঁদের সীমানায় প্রবেশ করে নিজস্ব কক্ষপথে 'চন্দ্রযান-২' চাঁদকে পরিক্রমণ শুরু করেছে। আগামী এক বছর সে 'ইসরো'কে চাঁদের নানা তথ্য পাঠাবে। 'চন্দ্রযান-২' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের মাটিতে নামার সময় 'ইসরো'র সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ডঃ বিক্রম সারাভাই এবং ডঃ হোমি ভাবা থুম্বা পরিদর্শন করছেন

চাঁদের গাড়ি 'প্রজ্ঞান'কে পেটের ভেতর নিয়ে সে কি অবস্থায় চাঁদের মাটিতে রয়েছে তা জানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। সে সব তথ্য জানতে আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। যখনই চাঁদের দিকে চোখ যাবে মনে পড়বে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে গড়া এই 'চন্দ্রযান-২' মহাকাশ রহস্যকে বিষয় করে বানানো হলিউডের একটি বাণিজ্য সফল চলচ্চিত্র 'ইন্টাস্টেলার' তৈরীর খরচের থেকেও কম খরচে চাঁদে পৌঁছে গেছে।

চাঁদের গান

সুজয় বাগচী

চাঁদের সঙ্গে আমাদের ছোটবেলার সম্পর্ক। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে ছোটবেলায় যাকে আদর করে তার মা 'আয় আয় চাঁদমামা টি-দিয়ে যা' বলেনি। বাচ্ছার কপালের কাজলের টিপেও মা চাঁদের ধব্‌ধবে সাদা রূপ দেখতে পেতেন। কারণ তাঁর শিশুটিও একটি চাঁদ। তাই তিনি বলেন 'চাঁদের কপালে চাঁদ টি-দিয়ে যায়'। চাঁদের সাথে আত্মীয়তার জন্ম সেই তখন থেকেই। সূর্য, চন্দ্র আমাদের প্রত্যেকের 'মামা', মায়ের চেনানো মহাজাগতিক আত্মীয়। সূর্যের প্রখর রৌদ্র তার সাথে আত্মীয়তার অন্তরায় হলেও চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আর শান্ত রূপ তাই সকলের এত প্রিয়। তাই আনন্দের অনুসঙ্গ জড়িয়ে আছে চাঁদের সাথে। 'চাঁদ উঠেছে , ফুল ফুটেছে , কদমতলায় কে? হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, সোনামনির বে।' প্রাণপ্রিয় কন্যার বিবাহের দিন গোটা দুনিয়া খুশিতে ভরে উঠবে এমন কামনাতো সব বাবা-মায়ের। সেদিনটি তে পূর্ণিমার দিনের মতই আলো ঝলমলে। পূর্ণিমার রাত মানেই এক অন্যরকমের মাদকতা। চাঁদের প্রভাবেই সকলের মনে কত না অনুভূতি জেগে ওঠে। সকলের পক্ষে সম্ভব হয়না সেই অনুভূতিকে ঠিকঠাক প্রকাশ করার। আমাদের এই অক্ষমতা ঢেকে দিয়েছে চাঁদকে বিষয় করে তৈরী হাজারো গান। কিছু গান কালজয়ী, চাঁদের মতই সঙ্গীতের আকাশে তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেই সব গানের কথা চোখে পড়ামাত্র সুর গুনগুনিয়ে উঠবে।

শিশুকে মায়ের অনাবিল আদরে চাঁদ চলে আসে উপমা হয়ে। শচীন দেববর্মণের সুরে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'চন্দ্র যে তুই, আমার সূর্য্য যে তুই, ও আমার চোখের তারা যে তুই' গানটি যেন সব মায়ের মনের কথা। আসল গানটি হিন্দিতে আনন্দ বক্সীর লেখা, যদিও কথার অর্থ একই। 'চান্দা হ্যায় তু, মেরা সুরজ হ্যায় তু, ও মেরে আঁখোকে তারা হ্যায় তু।' বাংলার বহু কবিতা গানে চাঁদ আছে। কবিতা থেকে যে সব গান হয়েছে তাদের মধ্যে চাঁদের কথা বললে প্রথমেই মনে পড়ে যতীন্দ্রমোহন বাগচী'র লেখা 'কাজলা দিদি' কবিতা'টি। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই' গানটি শুনলে আজও প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথা আমাদের বুকে মোচড় তোলে।

চাঁদ যেমন মায়ের আদর, যেমন স্বজন হারানোর ব্যথা তেমনিই চাঁদ মানে প্রেমের অনুভূতি। গীতা দত্তের সুরেলা গলায় 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে' গানটি কানে এলেই মনে হয় চারিদিক যেন জোৎস্নায় ভরে গেছে। বাংলার আর এক মধু মাখা কণ্ঠ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবীরাত, আসেনিতো বুঝি আর, জীবনে আমার' গানটিও একই রকম অনুভূতি জাগায়। 'সবার উপরে' ছবির এই গানটি সকলেরই পছন্দের গানের তালিকার ওপরের দিকেই থাকবে। 'দুই পুরুষ' ছবিতেও শিল্পীর গাওয়া 'চাঁদের এত বাহার, ভরা পূর্ণিমা রাতে' গানটিও চাঁদের সৌন্দর্য্যকে যেন নিংড়ে বার করে আনে।

বাংলা সিনেমায় চাঁদ, চাঁদের জ্যোৎস্না বা চাঁদের সঙ্গে তুলনা টেনে অনেক গান লেখা হয়েছে। তাতে স্বর্ণযুগের ছবি থেকে আজকের দিনের পুরদস্তুর আধুনিক ভাবনার ছবিতেও গানের কথায় চাঁদের প্রসঙ্গ চলে আসছে। সব গান জনপ্রিয় না হলেও ছবির ক্ষেত্রে গানগুলি প্রয়োজনীয়। মায়ার সংসার ছবিতে প্রণব রায়ের কথায় আর রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন 'ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে'। বিরাজ বৌ ছবিতে শ্যামল মিত্র গাওয়া 'কত চাঁদ আর হারালো যে সুধা, কত কাল গেল ভাসি' গানটি উত্তমকুমারের লিপে। ললিতা ছবিতে বনশ্রী সেনগুপ্ত গেয়েছেন 'আমি যে জ্যোৎস্না রাতের মায়াবিনী চাঁদ' গানটি। আশির দশকের বাণিজ্যসফল 'গুরু দক্ষিণা' ছবিতে ভবেশ কুণ্ডুর লেখায় বাপী লাহিড়ী'র সুরে আশা ভোঁসলের গাওয়া 'আকাশের চাঁদ মাটির বুকেতে জোছনার রঙ ভরে, আমার জীবনে কেন বারে বারে তোমাকেই মনে পড়ে' গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা গানের স্বনামধন্য গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা আগামিকাল ছবির 'একটা আকাশ তাতে একটাই চাঁদ ওঠে, দুটো চাঁদ কখনও কী চাওয়া যায়?' গানটিও জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি হিন্দি ছবির বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক জুটি লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের সুরে গেয়েছিলেন অমিত কুমার ও চন্দ্রানী মুখার্জী। ছেলে অমিতের মতই পিতা কিশোর

কুমারও যে সব অসাধারণ বাংলা গান গেয়েছেন তার মধ্যে প্রতিশোধ ছবির 'আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ ঘোচায় অন্ধকার' আর আশ্রিতা ছবির 'নীল নীল আকাশে, চাঁদ যখন ওই আসে, তৃষ্ণা মনের মিটিয়ে দেয়' সকলেরই পছন্দের গান। নতুন শতকের 'নটবর নট আউট' ছবিতে আজকের যুগের জনপ্রিয় শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া 'মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে, বুক ধুকপুক চাঁদপানা মুখ চিলেকোঠা থেকে হাসছে' গানটিও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়। শহুরে আধুনিকতার গল্প শোনানো এই গানটি লিখেছেন 'চাঁদের পাহাড়' আর 'আমাজন অভিযান' খ্যাত চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া 'ফ্লপ-ই' ছবির কথা মনে না থাকলেও 'চাঁদটা যদি কিনেও ফেল' গানটি বেশ ভালো। এখন বাংলা ছবির জনপ্রিয় জ্যঁর রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা। সেই ধারায় একেবারে অন্য রকম ছবি বানিয়ে চলেছেন অরিন্দম শীল। তাঁর পরিচালনায় 'আসছে আবার শবর' ছবিতে 'ভাঙা মন, ভাঙা চাঁদ' গানটি রয়েছে।

বাংলা গান মানে শুধু সিনেমা বা ছায়াছবির গান নয়। আধুনিক গানের ভাণ্ডারও সমান সমৃদ্ধ। ১৯৩৭ সালে সুরসাগর হিমাংশু দত্ত তৈরী করেন তাঁর বিখ্যাত ও সর্বজনবিদিত 'চাঁদ কহে চামেলি গো' গানটি। সুবোধ পুরকায়স্থের লেখায় সুর সৃষ্টি করে তিনি স্বকণ্ঠে গানটি রেকর্ড করেন। ১৯৪০ সালে সুনির্মল বসু'র কথায় সুরারোপ করে শিল্পী উমা বসুকে দিয়ে সুরসাগর গাওয়ালেন 'আকাশের চাঁদ মাটির ফুলেতে যবে হল পরিচয়' গানটি। পঞ্চাশের দশকে বেগম আখতারের গাওয়া সেই বিখ্যাত গানটি কে ভুলতে পারে? 'জোছনা করেছে আড়ি, আসেনা আমার বাড়ি, গলি দিয়ে চলে যায়, লুটিয়ে রূপালি শাড়ি।' রবি গুহমজুমদারের কথা ও সুরে আখতারিবাঈয়ের অনন্য কণ্ঠস্বর গানের সাথে চাঁদকেও অমর করে রেখেছে। ১৯৬৮ সালে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেকর্ড করেন 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে বিরহীর ব্যথা লয়ে।' এই একই গান অনুপ ঘোষাল রেকর্ড করেন ১৯৭৮ সালে। অখিলবন্ধু ঘোষ 'আজি চাঁদনি রাতি গো', 'সেদিন চাঁদের আলো চেয়েছিল জানতে ওর চেয়ে সুন্দর কেউ আছে কী? আমি তোমার কথা বলেছি' কথা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সুর শিল্পী। কমল ঘোষের কথায় এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে তালাত মাহমুদ গাইলেন 'চাঁদের এত আলো'। সলিল চৌধুরীর গানে চাঁদ মানে বাস্তবতা থেকে দূরে চলে যাওয়া। তাই তাঁর কথা ও সুরে লতা মঙ্গেশকরের 'আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমের, চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়' গানটিতে চাঁদের রূপে মুগ্ধ না হতেই বলা হচ্ছে। কিশোর কুমারের নিজের সুরে গাওয়া 'সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা' গানে আবার চাঁদের রূপমুগ্ধতা। মান্না দে'র গানে চাঁদ এসেছে প্রেমের দাবি নিয়ে। তাই কখনও চাঁদনি রাতে বেসামাল হয়ে চাঁদের কাছেই অনুযোগ করেছেন 'ও চাঁদ সামলে রাখ জোছনাকে', আবার কখনও প্রেমিকার কাছে অকপট স্বীকারোক্তি 'চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি'। আজকের আধুনিক বাংলাগানের একটি জনপ্রিয় ধারা জীবনমুখীগানের পথিকৃত সুমন চাটুজ্যে মানে আজকের কবীর সুমন নিজের কবিতায় সুর করে গেয়েছেন 'মাঝ রাত্তিরে চাঁদের কাস্তে, ধারালো হচ্ছে আস্তে আস্তে।' বাঁকা চাঁদকে দেখে তাঁর ধারালো কাস্তের কথা মনে হয়েছে। যে কাস্তে আসলে মানুষের ওপর প্রকৃতির আঘাত হানার ইশারা। আজকের দিনের জনপ্রিয় শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ 'চাঁদ কেন আসেনা আমার বাড়িতে।' তাঁর এই রাগাশ্রয়ী গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। আধুনিক বাংলা গানের আর এক জনপ্রিয় শিল্পী রূপঙ্কর বাগচীর চাঁদকে বলে রেখেছেন 'ও চাঁদ তোর বান্ধবীদের সঙ্গে যাব।'

বাংলার নিজস্ব লোকগীতির ভাণ্ডারে চাঁদকে নিয়ে অসংখ্য গান। লালন সাঁইয়ের গান 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' যতটা পরিচিত, ঠিক ততটাই অপরিচিত এই গানের কথার মূলঅর্থ। ফকিরী গান দেহতত্ত্বের গান। সেখানে চাঁদ মানে রূপ সৌন্দর্য। নারী এমনিতেই সুন্দর আর সে যখন যৌবনে পৌঁছায় তখন তার রূপ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে, অর্থাৎ 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লাগে।' এমনই আর একটি বহুল জনপ্রিয় গান 'সোহাগ চাঁদবদনী ধনি নাচতো দেখি।' এখানেও ধনি অর্থাৎ সুন্দরী নারীর মুখাবয়বকে চাঁদের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

যত না গানের কথা লেখা হল তার থেকে বাদ পরল বেশী। তবে চাঁদ নিয়ে গানের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেনের মত গীত স্রষ্টাদের ইচ্ছা করেই বাদ রেখেছি। তাঁদের সঙ্গীতের ভাণ্ডারে চাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলা গানের মতই হিন্দিতেও চাঁদকে নিয়ে অসংখ্য গান হয়েছে। হিন্দি সিনেমায় ছবির প্রয়োজনে চাঁদকে নিয়ে গান লেখা হয়েছে। সে সব গানের জনপ্রিয়তাও আকাশ ছোঁয়া। চাঁদের প্রতি আকর্ষণ, মুগ্ধতা যত দিন থাকবে ততদিন চাঁদকে গান লেখা হবে, গাওয়া হবে, শোনা হবে এবং মানুষ গুনগুন করতে থাকবে।

ছবিতে চাঁদ - ১

মাইকেল জ্যাকসনের বিখ্যাত নৃত্যশৈলী 'মুন ওয়াক'

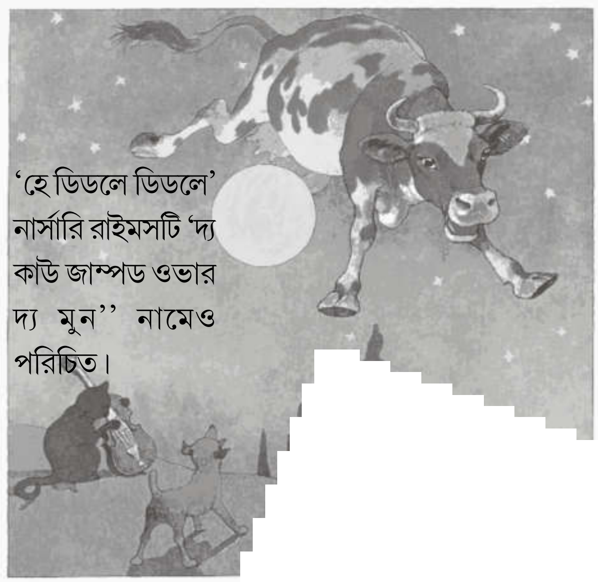

'হে ডিডলে ডিডলে' নার্সারি রাইমসটি 'দ্য কাউ জাম্পড ওভার দ্য মুন'' নামেও পরিচিত।

'মুনফেজ' ঘড়িতে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়।

২০ জুলাই
তারিখটি
আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রে
'মুন ডে'
হিসাবে পালিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় চন্দ্র

সৌমেন নাথ

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু সাহিত্য, ভাস্কর্য, ধর্মীয় চিহ্ন (Motif) ইত্যাদিতে দেখা যায়। সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার সময়কার বিভিন্ন সীল এর সাক্ষ্য দেয়। প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে চাঁদ আর সূর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার ফলশ্রুতিতে পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত চন্দ্র আর সূর্যের সাথে বংশানুক্রম আনার বিভিন্ন কথা জানা যায়।

সাধারণভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীকে ইতিহাস চিহ্নিত করেছে ভারতীয় উপমহাদেশে মুদ্রার আদিপর্ব হিসেবে। এইসময়ে আমরা দেখতে পাই ষোড়শ মহাজনপদ। এদের প্রত্যেকের আলাদা ধরনের চিহ্নবিশিষ্ট মুদ্রা ছিল। বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার ছাড়াও এই মুদ্রায় বিভিন্ন পশু (হাতি, হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি), পাখি (মূলত ময়ুর), কচ্ছপ, বিছে, মাছ, ফুল, পাতা, পাহাড়, নদী, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি দেখা যায়। আসলে এই পর্যায়ে মুদ্রায় লিখিতভাবে কোন রাজা বা রাজবংশের কথা থাকত না। এই চিহ্নগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ রাজার ধর্মমতের একটা বাহ্যিক প্রকাশ ছিল। এছাড়াও মনে করা হয় বিভিন্ন যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কিছু মুদ্রা তৈরী করা হত, যেখানে ঐ যজ্ঞের ছবি থাকত। যেমন বলিকাঠের সামনে ঘোড়া দিয়ে অশ্বমেধ বা বলিকাঠের সামনে ষাঁড় দিয়ে বৃযোৎসর্গ বোঝানো হত। মুদ্রায় এভাবে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার অনুশীলনকে এক আকর্ষণীয় পাঠ করে তুলেছে।

আমরা একটু দেখি প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় চাঁদকে কিভাবে দেখান হয়েছে।

ষোড়শ মহাজনপদের উৎপত্তি বুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে ফলে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমত সেই সময়ে জনজীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। রাজন্যরাও এর বাইরে থাকতে পারেননি। ''While all the other ksatriya clans that claimed a portion of the ashes of the great teacher, did so on the basis of their belonging to the same caste ('Bhagava pi khattiyo, mayam pi khattiya') ' - Some Ksatriya Tribes of Ancient India by Bimala Charan Law,P-163' । প্রচুর স্তূপ তাঁরা যেমন তৈরী করেছিলেন তাঁদের মুদ্রাতেও সাঙ্কেতিক ভাবে সেই স্তূপের প্রকাশ দেখা যায়। তিনটে পাহাড় আর তার ওপর অর্ধচন্দ্রাকার একটা চিহ্ন - এই ছিল একদম প্রাথমিকরূপ। মৌর্য বংশের মুদ্রায় ব্যাপকভাবে এই চিহ্ন শুরু হলেও পরবর্তীতে তক্ষশীলা, শুঙ্গ, কুনিন্দা, পশ্চিমী ক্ষত্রপরা, সাতবাহনরাও এটা ব্যবহার করেন। বলা হয় এই চিহ্ন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের Royal Insignia ছিল। এই অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন দিয়ে 'মেরু (ভাল অর্থে সুমেরু)' কে বোঝান হয়। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে এই 'মেরু' পৃথিবীর কেন্দ্র।

চিত্র-১, মৌর্য মুদ্রা

মৌর্য পরবর্তী মুদ্রা, তক্ষশীলা-১

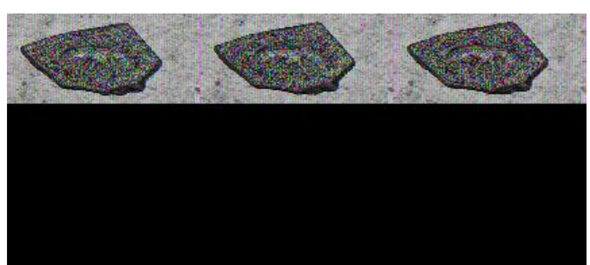

মৌর্য পরবর্তী মুদ্রা, তক্ষশীলা-২

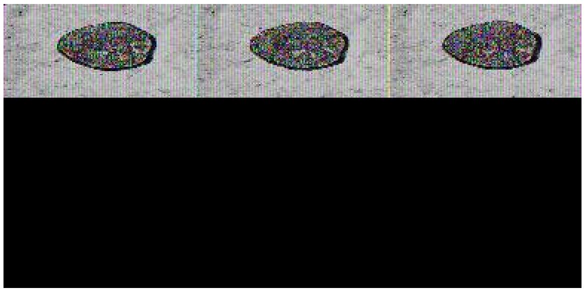

মৌর্য পরবর্তী মুদ্রা, তক্ষশীলা-৩

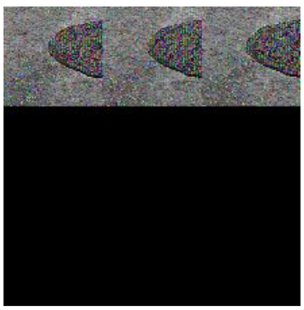

মৌর্য পরবর্তী মুদ্রা, বিদর্ভ এলাকা

শুঙ্গ মুদ্রার ক্ষেত্রে একটা মজার জিনিস দেখা যায়। ঐতিহাসিকরা যদিও এনাদের বৌদ্ধবিরোধী বলে থাকেন কিন্তু এনাদের মুদ্রায় মৌর্য আমল থেকে প্রচলিত ‘তিনটে পাহাড় আর তার ওপর অর্ধচন্দ্রাকার একটা চিহ্ন’ এনারা ব্যবহার করে গিয়েছিলেন। আসুন কিছু শুঙ্গ মুদ্রা দেখা যাক।

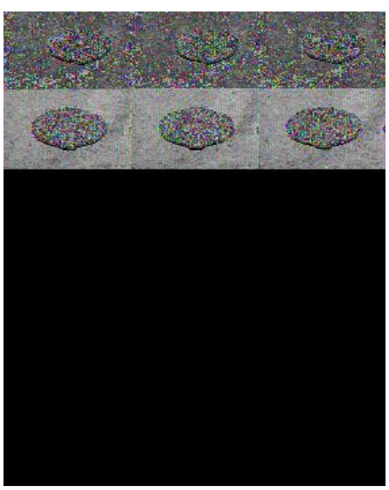

শুঙ্গ মুদ্রা - ১

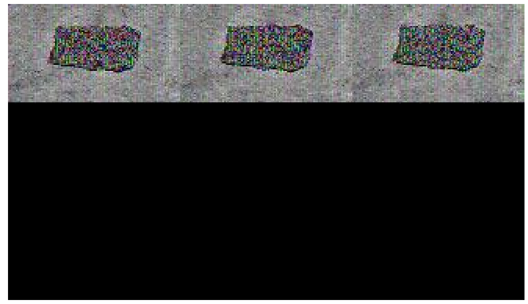

শুঙ্গ মুদ্রা - ২

এখনকার উত্তরাখন্ড আর হিমাচলের দক্ষিণ এলাকা জুড়ে কুনিন্দাদের রাজ্য ছিল (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী- খ্রিষ্টীয় ৩য় শতাব্দী)। মহাভারতে এদের উল্লেখ আছে। এদের একদম প্রথমদিকের রাজা ছিলেন অমধভুতি (খ্রীঃপূঃ ২য় শতাব্দী - খ্রীঃপূঃ ১ম শতাব্দী, আনুমানিক)।

কুনিন্দা মুদ্রা, অমোঘভুতির নামাঙ্কিত

সাতবাহনদের (খ্রীঃপূঃ ১ ম শতাব্দী - খ্রীষ্টিয় ২য় শতাব্দী) সাম্রাজ্য মূলতঃ এখনকার তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্র নিয়েই বিস্তৃত ছিল। এনাদের বেশ কিছু মুদ্রায় এই ত্রিরত্ন দেখা যায়।

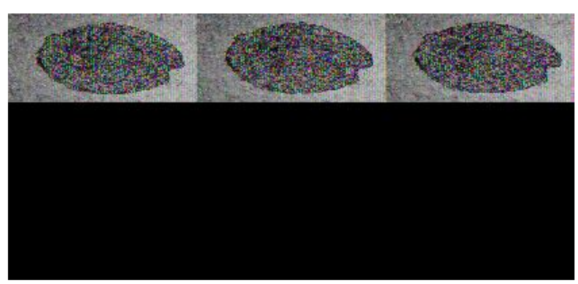

সাতবাহন মুদ্রা - জুন্নার সিংহ ধরণ

পশ্চিমী ক্ষত্রপ (ভদ্রমুখ বা করদমক পরিবার, চাস্তানা বংশীয়) - এনাদের (খ্রীষ্টিয় ১ম শতাব্দী) রাজত্ব মূলতঃ এখনকার গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্র নিয়ে ছিল।

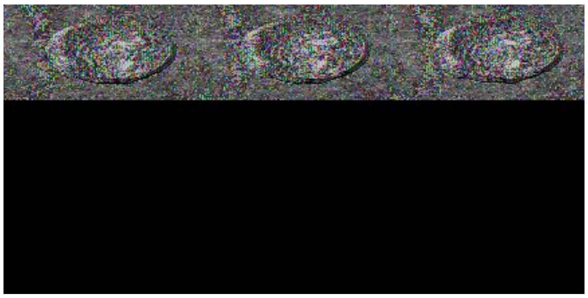

পশ্চিমী ক্ষত্রপ, রুদ্রসিংহ -৩
(৩৮৮ - ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দ) এর মুদ্রা

চাঁদ কে চন্দ্রদেব হিসেবে দেখা যায় কুষান সম্রাট প্রথম কনিস্কের (১২৭ - ১৫০ খ্রীঃ) আর তাঁর ছেলে প্রথম হুবিস্কের (১৫৫ - ১৮৯ খ্রীঃ) মুদ্রায়। এখানে চন্দ্রদেবকে 'Mao' নামে দেখান হয়েছে। মুদ্রার একদিকে কণিষ্কের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে চন্দ্রদেব মাও। মাও-এর ডানদিকে ব্যাক্ট্রিয়তে 'মাও' লেখা। চন্দ্রদেবের কাঁধের ওপর অর্ধচন্দ্র (Crescent)।

প্রথম কণিষ্কের (১২৭ - ১৪০ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রায় চন্দ্রদেব
(স্বর্ণ, দিনার) Ack- Coinindia

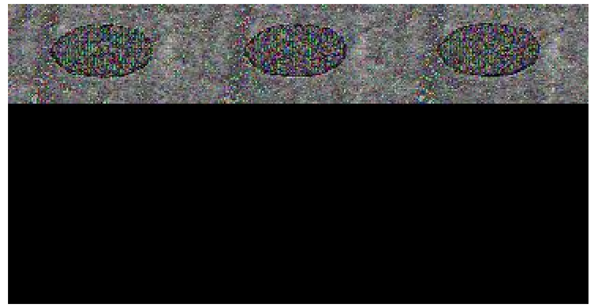

প্রথম কণিষ্কের (১২৭ - ১৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
মুদ্রায় চন্দ্রদেব (ব্রোঞ্জ)

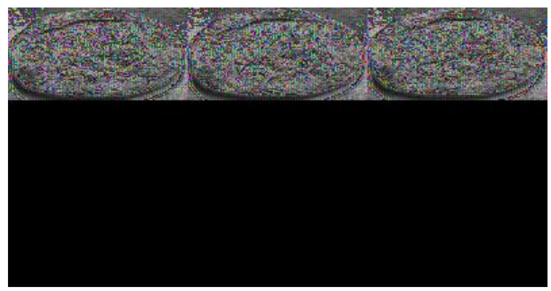

প্রথম হুবিস্কের (১৬০ - ১৯০ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রায় চন্দ্রদেব
(ব্রোঞ্জ) Ack- Coinindia

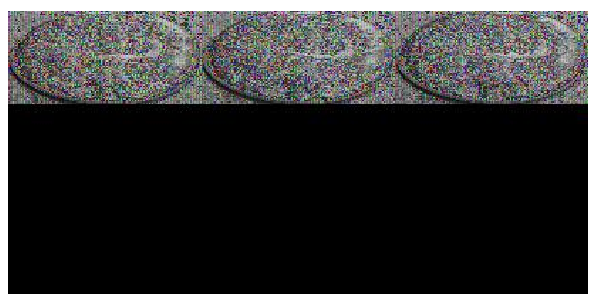

প্রথম বাসুদেবের (১৯০ - ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রায় চন্দ্রদেব
(স্বর্ণ, দিনার) Ack- Coinindia

পরবর্তী সময়ে চাঁদ আর অনেকের মুদ্রায় দেখা গেছে, বিশেষত মধ্যযুগে। কিন্তু সেটা আলাদা অংশ।

সহায়ক বই ও website:

1. Coins- Dr. P.L.Gupta
2. Indigenous States of Northern India (Circa 200 B.C. to 320 A.D.)- Bela Lahiri ,
3. Coinindia website
4. Some Ksatriya Tribes of Ancient India - Bimala Charan Law
5. Buddhism in India: From the Sixth Century B.C. to the Third Century A.D.- Ashok Kumar Anand

ছবিতে চাঁদ - ২

ডাকটিকিটের বিষয় চাঁদ এবং চন্দ্রাভিজান

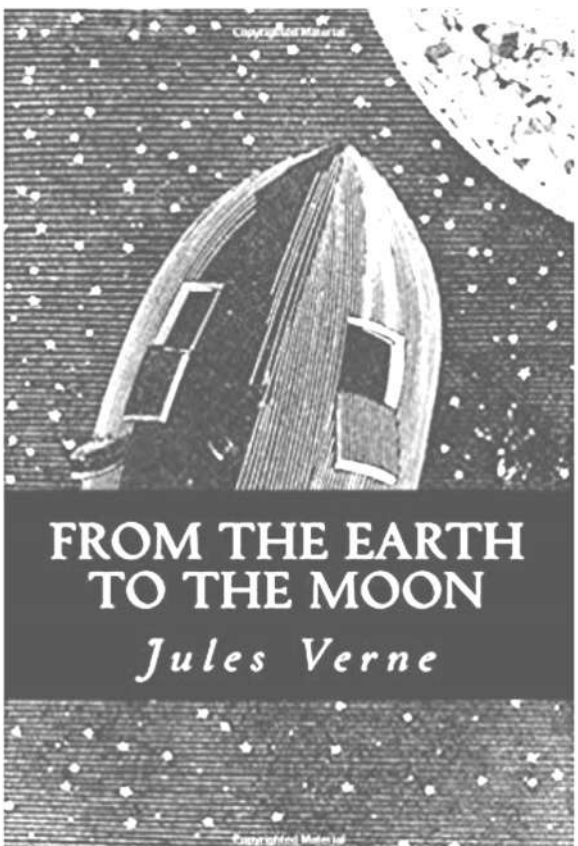

জুলে ভার্নে'র লেখা চন্দ্রাভিযানের কল্পকাহিনী'র প্রচ্ছদ

মার্টিন স্করসেসের 'হুগো' সিনেমায় চাঁদের চোখে রকেট ছোঁড়ার ছবি

চাঁদের মাটিতে নামা প্রথম কৃত্রিম যান 'লুনাখোদ'

চাঁদের ছবি তোলা নিয়ে দু'চার কথা

প্রদীপ ভট্টাচার্য

মানবসভ্যতার সেই আদিম লগ্নে মানুষ যেদিন প্রথম মনুষ্যোচিত চেতনার অধিকারী হলো, সেদিন থেকেই সম্ভবতঃ চারপাশের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আকাশই তাকে সবথেকে বেশী আকর্ষণ করেছে, তার কৌতুহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। ঘন ঘোর তমিস্রার মধ্য থেকে একটু একটু করে দিনের আলো ফুটে উঠতে থাকা, দিগন্তে একটি বড় লালগোলার আবির্ভাব, তারপর সারাদিন ধরে তার একটা নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাওয়া ও তীব্র কিরণ বিকিরণ, তারপর আবার একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে উল্টোদিকে তেজ হারিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং চারপাশ আবার আস্তে আস্তে গাঢ় থেকে গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া, এ তো এক পরম বিষ্ময়কর ব্যাপারই! কিন্তু তার থেকেও বিষ্ময়কর, সেই অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত আকাশ জুড়ে ঝোপঝাড়ে মিটমিট করতে থাকা জোনাকির মতো অগুনতি খুদে খুদে যেন আকাশে জোনাকিরই উদয়। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে আকাশে আর এক অদ্ভুত সুন্দর রুপালি বস্তুর আবির্ভাব। সে ক্রমশঃ সরু থেকে চওড়া হতে হতে রাতের গাঢ় অন্ধকারকে যেন হালকা করতে থাকে। রাতেও কেমন প্রকাশিত হতে থাকে চারপাশ - সামনের ঝোপটা থেকে শুরু করে সেই দূরের পাহাড়টা পর্যন্ত সবকিছু। দিনের সেই আগুনের গোলাটার দিকে যেমন মোটে তাকানো যায় না, আর চারপাশটা যেন কেমন প্রবল উত্তাপে ঝলসে যায়, এ কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। এরদিকে যতক্ষণ ইচ্ছে তাকিয়ে থাকা যায়, শুধু তাই নয় আলোর ভাগটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে যেদিন সে পুরো গোল চাকতিতে পরিণত হয়, তখন চারপাশটা যেমন একেবারে পরিস্কার হয়ে যায়, তেমনি তার গায়েও হালকা কালো কেমন ছোপ দেখা যায়। এত আলো, কিন্তু কই গায়ের চামড়ায় তো তার একটুও আঁচ লাগে না! আর রূপ! রাতের আঁধারে ওই বড় গাছটার ঝাঁকড়া পাতার ফাঁকে যখন তাকে দেখা যায়, কিংবা পাহাড়টার পেছন থেকে যখন টুপ করে আকাশে উঠে পড়ে বা মাঝ গগন থেকে নীচের হ্রদের জলে যখন তার চেহারাটা দেখা যায় তখন ওই আকাশের জোনাকি, এই রূপালি জিনিষটা, দূরের পাহাড় সব মিলিয়ে কেমন সুন্দর দেখায় চারপাশটা, চেতনাযুক্ত মানুষের রূপ অনুভব করার শুরুও বোধহয় তখন থেকেই।

তারপর তো কত সহস্র বছর কেটে গেছে। মানুষ তার অফুরন্ত কৌতুহল, বাঁধনহীন কল্পনা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, নির্মম যুক্তি এবং দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে স্থল, জল ও অন্তরীক্ষের বহু অজানা রহস্যের সমাধান করে সমস্ত প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। আকাশ ছাড়িয়ে সে এখন মহাকাশ পরিভ্রমণে রত। ব্রহ্মান্ডের সব রহস্যের সমাধান করার জন্য সে ব্যাকুল। কিভাবে এই জগত সৃষ্টি হলো, তা অন্বেষণে সে এখন ব্যস্ত। সেদিনের সেই পরম আশ্চর্য রূপালী থালাটার অন্ধিসন্ধি সে এখন জানে। এমনকি, সেখানে মহাকাশযানে চড়ে পৌঁছেও গিয়েছে সে। হেঁটে এসেছে তার বুকে যেমন সে হাঁটে এই পৃথিবীর মাটিতে। তবুও এখনও তার জানার চেষ্টার কোন বিরাম নেই। স্বেচ্ছাচারী অমানুষ হীরক রাজার মতো সে বলে না '' জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই''। সে বলে — জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টারও তাই বিরাম নাই। তাই এখনও সে সেখানে যন্ত্র পাঠিয়ে তার না জানা রহস্যের উন্মোচনে ব্যস্ত। সেই রাতের বিস্ময়, চাঁদ এখনও তার কল্পনাকে উসকে দিতে পারে, পারে তার সৌন্দর্য চেতনাকে অনুভূতিশীল করতে।

চাঁদকে নিয়ে দূর অতীত থেকেই কবিরা রচনা করেছেন কাব্য, চিত্রশিল্পী এঁকেছেন ছবি। যখন ফটোগ্রাফি আবিষ্কার হলো, ফটোগ্রাফার তখন থেকেই চাঁদকে ফ্রেমবন্দী করতে চেয়েছেন। আজকের ডিজিট্যাল ফটোগ্রাফির যুগেও যখন ক্যামেরা অত্যন্ত সুলভ এবং হাতের মোবাইলটাও সমানে ক্যামেরার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তখনও কিন্তু চাঁদ ফটোগ্রাফির একটা আকর্ষণীয় বিষয় হিসাবেই বিবেচিত হয়। সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ মতো এই ছোট্ট নিবন্ধে চাঁদের ফটো তোলা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

চাঁদের ছবি তোলার সময় প্রথমেই ফটোগ্রাফারের নিজের কাছে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, চাঁদের কেমন ছবি তিনি তুলতে চান। যেমন, যদি কোন বনপথে হাঁটতে হাঁটতে গাছের সারির মাথায় চাঁদ এরকম কোন দৃশ্য তোলার দরকার হয় তাহলে যে কোন ক্যামেরায় তা তোলা যাবে, এমনকি যে

কোন ভালো অ্যানড্রয়েড ফোন হলেও চলবে। তবে সেক্ষেত্রে হয়তো ছবি তোলার পর সামান্য এডিট করার দরকার হয়ে পড়বে, কারণ আকাশের চাঁদ এবং নীচে গাছের সারি সমান উজ্জ্বল নয়। কিন্তু ছবি তোলা বলতে মূলতঃ ক্যামেরায় ছবি তোলাই বোঝায়, যদি সেই ছবিকে মানের দিক থেকে উন্নত হতে হয়।

আগেই বলেছি, পরিবেশ ও প্রকৃতির আর পাঁচটা জিনিষের সঙ্গে চাঁদকে রেখে ছবি তুললে যে কোন সাধারণ মানের ডিজিট্যাল ক্যামেরা চলতে পারে, যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথার ওপর চাঁদ এক্ষেত্রে ক্যামেরাকে 'W' অর্থাৎ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মোডে রেখে সাটার টিপলেই ক্যামেরা তার লেন্স এবং সেন্সরের ক্ষমতা অনুযায়ী একটা মোটামুটি ছবি তুলে নেবে, সেটি যদি তার কম্পোজিশন ঠিকঠাক থাকে তবে সোস্যাল মিডিয়ায় বেশ প্রশংসিতই হবে বা বন্ধুপরিজনদের দেখিয়ে তাদের বাহবাও কুড়োতে পারে। কিন্তু ফটোগ্রাফার যদি ছবি তোলার ব্যাপারে কিছুটা সিরিয়াস হন, যাকে বলে সিরিয়াস অ্যামেচার, তা হলে কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটি DSLR ক্যামেরা এবং একটি tripod থাকতেই হবে। এমন নয় যে, ক্যামেরা হাতে ধরে চাঁদের ছবি তোলা যাবে না, তবে ওই যে বললাম একটু ধরে বেঁধে ভালো ছবি তুলতে গেলে এটুকুর দরকার আছে। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই ছোট নিবন্ধে আমি ছবি তোলার প্রাথমিক বিষয়গুলি নিয়ে কোন কথা বলব না যেমন ISO সেটিং কি বা ডেপথ্ অফ্ ফিল্ড (depth of field) বলতে কী বোঝায় এইসব আর কী! কারণ এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, যিনি চাঁদের ছবি তুলতে চান, ছবি তোলার বেসিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনি পরিচিত।

আগের কথায় ফেরত যাই। ক্যামেরার কথা বললেই, সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনেকেই ক্যামেরাটি কত মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সেই ব্যাপারেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেন? আসলে তাদের ধারণা ক্যামেরার মেগাপিক্সেল যত বেশি হবে, ছবিও তত স্পষ্ট হবে, ছবিতে গ্রেণ থাকবে না ইত্যাদি। ব্যাপারটা পুরোপুরি মিথ্যা নয়। পিক্সেল সংখ্যার সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়দুটির সম্পর্ক আছে, সেটা ঠিক কিন্তু পুরোটা নয়। যদি একটু খোঁজখবর করেন তো দেখবেন, পঁচিশ বা তিরিশ হাজার টাকায় আপনি যত মেগাপিক্সেল সমন্বিত ক্যামেরা কিনবেন, দেখবেন তার তিনগুণ দামের একই কোম্পানির কোন DSLR ক্যামেরায় হয়তো তার থেকে অনেক কম মেগাপিক্সেল। আসলে ছবির স্পষ্টতা নির্ভর করে ক্যামেরার সেন্সরের আকারের ওপর। সেন্সরের সাইন যত বড় হবে, সেই ক্যামেরার ছবিও তত ভালো (স্পষ্ট) হবে। আপনি চাঁদের ছবি তুলবেন মানে চাঁদের ফুলফ্রেম ছবি তুলতে চাইবেন । এরজন্য আপনার ক্যামেরার Zoom লেন্সটি অন্ততঃ ২০০ মি.মি.বা তার বেশি হতে হবে। আজকাল বাজারে যে সব প্রোজুমার ক্যামেরা আসছে তাতে তো ৪০X, ৬০X, ৯০X মায় ১২৫X জুমও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অতটা দরকার নেই। মোটামুটি ২০০ মি.মি. বা ৩০০ মি.মি. পর্যন্ত জুমলেন্স থাকলেই যথেষ্ট।

ট্রাইপডে ক্যামেরা ফিট করে হাতে সাটার টিপলে ক্যামেরা নড়ে যাবার সম্ভবনা থেকে যায় (Camera Shake)। সেক্ষেত্রে একটি সাটার রিলিজ কেব্ল বা ওয়ারলেস রিমোট থাকলে ভালো - সাটার টেপার সময় ক্যামেরায় হাত দেবার দরকার পড়বে না। না থাকলেও ক্ষতি নেই। সেক্ষেত্রে ক্যামেরার সেল্ফ টাইমার সেট করে তোলা যায়। ফলাফল একই।

ব্যস, ছবি তোলার সরঞ্জাম তৈরি। এবার খুঁজতে হবে ছবি তোলার একটি জায়গা এবং সময়। যদি কেবলমাত্র চাঁদের ছবি তোলা আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পারিপার্শ্বিক সমস্ত আলো থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। এই সময়ে শহরগুলো তো বটেই এমনকি মফস্বল শহরগুলোতেও যেরকম আলোর ঝলমলানি, তাতে আলোকদূষণ (Light pollution) এক মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছে। সঙ্গে দোসর বায়ুমন্ডলের দূষণ। বস্তুতঃ বায়ুমন্ডল বিভিন্ন গ্যাস এবং ধূলিকণায় পূর্ণ বলেই বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাই তাতে প্রতিফলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে ভয়ঙ্কর আলোকদূষণ সৃষ্টি করেছে। অবস্থা এমনই যে, মাত্র কয়েকবছর আগে শরৎ, শীত বা বসন্তের কৃষ্ণপক্ষের আকাশে আমি স্বচ্ছন্দে আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় বা খোলামাঠে দাঁড়িয়ে যেসব নক্ষত্রমন্ডলী বা নক্ষত্রদের সনাক্ত করতে পারতাম, এখন সেটা পারি না। কাজেই চাঁদের একটি ঝকঝকে ছবি তোলার জন্য আপনাকে এমন কোন জায়গা বাছতে হবে যেখানে আলোর রোশনাই যথেষ্ট কম এবং বায়ুমন্ডলের দূষণও অসহনীয় নয়। এরকম বললে সাধারণতঃ

কোন পাহাড়ী জায়গা বা মফস্বল শহর থেকেও দূরের কোন অজ গ্রামের কথা মনে আসে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই কথাগুলো একটা আদর্শ জায়গার কথা মনে রেখে বলা। কে না জানে আদর্শের থেকে বাস্তবই আমাদের কাছে বেশী গ্রহণীয়। কাজেই আপনার পক্ষে যে জায়গাটা সুবিধাজনক তেমন জায়গা থেকে তুললেও চাঁদের ছবি তোলা আটকাচ্ছে কে?

কেবলমাত্র চাঁদের ছবি তোলার জন্য আপনার লেন্স বাছা হয়ে গিয়েছে, যেটা ২০০ বা ৩০০ মি.মি. টেলিলেন্স বা জুমলেন্স। আপনার ক্যামেরার ISO ১০০ বা তার কমে নির্দিষ্ট করুন। এরফলে ছবিতে গ্রেণ কম হবে। আপনার ক্যামেরাকে অটো থেকে M (ম্যানুয়েল) বা A (অ্যাপারচার প্রায়োরিটি) মোডে সেট করুন। যদি M মোডে ক্যামেরা থাকে তাহলে অ্যাপারচার (f no) ১১ বা ১৬ তে রাখুন এবং ১১ হলে সাটারস্পিড রাখুন $^{১}/_{১০০}$ সেকেন্ডে। স্বাভাবিক ভাবেই f১৬ হলে সাটারস্পিড হবে $^{১}/_{৬০}$ সেকেন্ডে। আর আপনার ক্যামেরাকে যদি A মোডে অর্থাৎ অ্যাপারচার প্রায়োরিটি মোডে সেট করেন, তাহলে সাটারস্পিড নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই, ক্যামেরা সেটা নিজে ঠিক করবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি প্রতিটি ক্যামেরা একটি নির্দিষ্ট অ্যাপারচারে সবথেকে ভালো ছবি দেয়। সাধারণতঃ সেটি f৪ বা f১১ হয়। আপনার ক্যামেরায় কোন অ্যাপারচারে সবথেকে স্পস্ট ছবি দেবে, তা আগে থেকে জেনে রাখুন (অনেক সময় ক্যামেরার সঙ্গে দেওয়া গাইড বইয়ে তা বলা থাকে) এবং অ্যাপারচার সেখানেই সেট করুন। বলাবাহুল্য, f সংখ্যা ৮ হলে সাটারস্পিড পাল্টে গিয়ে $^{১}/_{২০০}$ হবে। আবার বলি, এই ঝামেলা এড়াতে চাইলে ক্যামেরাকে অ্যাপারচার প্রায়োরিটি (A) মোডেই সেট করুন। আর হ্যাঁ, ম্যানুয়েল ফোকাস মোডে গিয়ে ইনফিনিটিতে ফোকাস করবেন অবশ্যই।

আপনি যদি DSLR ক্যামেরায় ছবি তোলেন তাহলে অবশ্যই RAW Fil মোডে বা JPEG-RAW মোডে ক্যামেরাটা সেট করবেন। RAW তে ছবি তুললে ছবির পোস্ট এডিটিং সহজে করা যায় এবং তোলা ছবির এক্সপোজারের অনেক ত্রুটি এডিট করে ছবিটিকে আরও সুন্দর করে তোল যায়। আর হ্যাঁ, DSLR ক্যামেরার মেনুতে আপনি White Setting এর অপ্‌শন্ পাবেন। এটি একটি জটিল ব্যাপার। আপনি স্রেফ এটিকে Auto তে রেখে দেবেন, তাহলে পরবর্তীকালে ছবিতে এডিট করার সময় আপনি আপনার পছন্দমতো টোন এবং রং ছবিতে আনতে পারবেন।

এবার বলি, যদি আপনি একটি নাইট ল্যান্ডস্কেপ তুলতে চান যেখানে আলোকশোষিত বহুতলবাড়ির সারি, আলোকমালায় সজ্জিত নগরীর মাথার ওপর চাঁদ বা দীঘির জলে চাঁদের লুটোপুটি বা আবছায়ার মধ্যে দাঁড়ানো সারিসারি বা একক গাছের মাথায় চাঁদ - এমন ধরনের ছবির ক্ষেত্রে ক্যামেরার সাধারণ ৫০ মি.মি. বা তার কম ফোকাললেন্সের লেন্স হলেই চলে। এখন তো মোটামুটি সব DSLR ক্যামেরার সঙ্গে ১৮-৭০ মি.মি. জাতীয় জুম লেন্স থাকে। এরকম একটি লেন্স থাকলেই হলো। এরপর ছবির এক্সপোজারের প্রশ্ন এবং বিপদটা এখানেই। এক্ষেত্রে পৃথিবীর উপরে থাকা যে কোন বস্তু এবং আকাশের চাঁদের মধ্যে আলোক ঔজ্জ্বল্যের এতটাই তফাৎ যে ছবি ওঠার পর দেখা যাবে আলোকউজ্জ্বল বহুতলের এক্সপোজার যদিবা ঠিক আছে মনে হচ্ছে, চাঁদ একটি হাজার ওয়াটের গ্লোবের মতো জ্বলজ্বল করছে। তার সব সৌন্দর্য ভ্যানিশ, যেমন সুন্দর মুখ অতিরিক্ত স্নো, পাউডার, রুজের দাপটে কুৎসিত হয়ে ওঠে। তাহলে উপায়? উপায় একটি আছে এবং সেটি করতে হলে একটু ফটোশপ্ জানা দরকার। আপনারা অনেকসময় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের পরের দিন খবরের কাগজেরপাতায় এমন ছবি দেখে থাকবেন, যেখানে একই ফ্রেমে গ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চাঁদের বিভিন্ন দশার ছবি দেওয়া থাকে। মাঝখানে থাকে পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাওয়া অনুজ্জ্বল চাঁদ। এটি চাঁদের আলাদা আলাদা ছবি, যাদের ফটোশপের সাহায্যে একই সাথে একটি ফ্রেমে সেট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডের রং একই থাকায় (অন্ধকার আকাশের কালো রং) এটা করতে অসুবিধা হয় না। ঠিক একই ভাবে, আপনার ছবির ক্ষেত্রেও দুটি আলাদা ছবি একটিতে চাঁদহীন আকাশের পট ভূমিকায় ফোরগ্রাউন্ডের বিষয়গুলির সঠিক এক্সপোজারে ছবি তুলে, আর একটিতে চাঁদের ছবি নিয়ে ফটোশপের মাধ্যমে প্রথম ছবির ওপর দ্বিতীয় ছবিটিকে (চাঁদকে) আপনার পছন্দসই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেই আপনার মনোমত ছবি পেতে পারেন।

এবার আসি পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ছবি তোলার কথায়। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ছবি তোলার মতো ঝামেলা চন্দ্রগ্রহণের ছবি তোলায় নেই। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে যেমন সূর্য চাঁদের ছায়ায় পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যায়, পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণে চাঁদ মোটেই অদৃশ্য হয় না।, বরং সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রতিসৃত হয়ে চাঁদকে কিছুটা লাল দেখায়। এটি 'ব্লাডমুন' নামে পরিচিত। পূর্ণচন্দ্রের তুলনায় গ্রহণগ্রস্ত চাঁদের উজ্জ্বলতা কম বলে আপনার ক্যামেরার এক্সপোজার সেটিংএও কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। শুধু তাই নয়, চন্দ্রের উজ্জ্বলতা গ্রহণ শুরু হবার পর ক্রমশঃ কমে আসছে বলে এই সেটিং এও ক্রমাগত পরিবর্তন দরকার। যদি আপনি ISO সেটিং এ বিশেষ পরিবর্তন না আনতে চান, তাহলে আপনার ক্যামেরার সাটারস্পিড S ÷úÐõ±hÂËi ÂýËõ, Õï ÇÈ ১/১০০ সেকেন্ড থেকে বাড়িয়ে ১/৮০ সেকেন্ড, ১/৬০ সেকেন্ড, ১/৩০ সেকেন্ড এইভাবে পরিবর্তন করতে পারেন। মনে রাখবেন, সাটার স্পিড ১/৩০ সেকেন্ড বা তার কম হলে ট্রাইপড অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

শেষ করার আগে দু'একটি তথ্য জেনে রাখা দরকার। চাঁদের ছবি অবশ্যই শুক্লপক্ষে তুলবেন কারণ কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী বা দশমীতে আপনি চাঁদকে যে দশায় দেখবেন, শুক্লপক্ষের ওই তিথিগুলিতে চাঁদের চেহারা একই রকম থাকবে, কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য থাকবে অনেক বেশি। চাঁদের গতিবিধি জানার জন্য কোন এফিমেরিস বা নিদেন রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ সঙ্গে রাখতে পারেন। আর হ্যাঁ, পকেটে একটা ছোট টর্চ থাকা ভালো, কারণ রাত্রে যেখান থেকে আপনি চাঁদের ছবি তুলবেন, সেখানে আলোর অভাবে ক্যামেরা সেট করতে অসুবিধা হবে। তাহলে আর দেরি কেন? ক্যামেরা ট্রাইপড কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ুন রূপবান চাঁদের ছবি তুলতে।

চাঁদ

প্রিয়া কুণ্ডু নন্দী

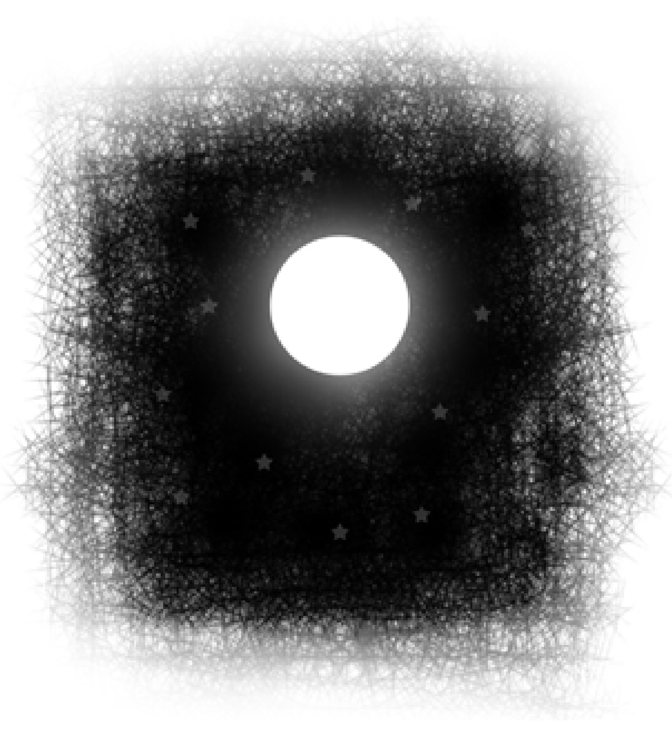

আকাশ গায়ে তারার ফোঁটায়
জলছবিটা আঁকা,
রামধনু মেঘ গোধূলি আলোয়
চাঁদের চিহ্ন রাখা।
ফিরছে বাড়ি পাখির সারি
আঁধার নামে ধীরে,
সূর্য ডোবার সাঙ্গ পালা
চাঁদ তারার ভীড়ে।
শুক্লপক্ষ যে আজ —
পুরোটা চাঁদ উঠবে,
গভীর রাতের ধাঁধা সমাধানে,
রূপকথার গেট খুলবে।

চাঁদের কিসসা

পল্টু ভট্টাচার্য

বিশ্বকবি লিখেছেন 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে ....' চাঁদ জিনিষটা যে কত হাস্যকর তা আমরা কি ভেবে দেখি? প্রথমেই বলি কৃষ্ণের অষ্টোতর শতনামের মতন চাঁদের অসংখ্য নাম, যেন দু'নম্বরী করে যে কোন আধার কার্ড দেখিয়ে কেটে পড়বে। তারাপতি, রজনীকা, রজনীকান্ত, নক্ষত্রপতি, বিধু, চাঁদ, চন্দ্র, চাঁদমামা, চাদ (ওপার বংলায় চন্দ্রবিন্দু বাদ) এরকম করে চলে চাঁদের সোহাগ। সেই ছোটবেলা থেকে শুনেছি 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা', ব্যাপারটা পুরো ঢপ, আজকের হাইটেক বাচ্চা বলতেই পারে 'এই তো সবে নেমেছ এরপর ওটাকে অতো কোটি মাইল দূর থেকে নিয়ে এসে আমার কপালে টিপের সাইজ করতে পারবে? কলকারখানগুলোও তো বন্ধ! চাঁদটাকে ছোট করবে কোথায় নবাব বাদশার আমলে তবু চাঁদের র‍্যালা ছিল। চাঁদকে দেখে ভারতবাসীর দিন, মাস, বছর কাটত। শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ফরমান দিলেন ওটা বুজরুকি হচ্ছে সূর্য দেখে দিন, মাস, বছর চালু হোক। সেই থেকে চাঁদের তারিখ এক পাশে পড়ে রইল। হায়রে চন্দ্রিমা! লেখক, সাহিত্যিকরা চাঁদকে এক অন্য মর্যাদায় রেখেছেন চিরকাল। রুটি, আধুলি, কনে বউ, প্রেমিক প্রেমিকাদের রেজিষ্টার, জোছনার আড়ি, কখনও জীবনের চাঁদনী, আমাদের পরিধানে সামান্য ময়লা থাকলে পাশে লোক বসে না কিন্তু চাঁদের গায়ে কলঙ্ক নাকি সুন্দরের প্রতীক, দুনিয়ার কাপড়কল, তাঁত ধুঁকছে তবু নাকি চাঁদের বুড়ির চরকা কাটা নৈসর্গিক দৃশ্য।

আসলে কপালে যার সুনাম থাকে তাকে আর বদনাম ছোঁবে কি করে? না হলে গান চলছে চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি, কোন জোছনায় বেশি আলো সেই দোটানায় পড়েছি ...... আচ্ছা ব্যাপারটা বাস্তব হলে ইভটিজিং হলো না? কথায় বলে 'সারাদিন যায় আলে খালে / সন্ধ্যে বেলায় পিদিম জ্বালে!' সারাদিন প্রেম ভালোবাসার দেখা নেই সন্ধ্যে হতেই সব প্রেম ভালবাসা ঐ আকাশের চাঁদকে ঘিরে তাও আবার পাক্ষিক। আসলে ধার করা আলো ভীষণ ভালো কদর পায়, আবার গৃহযুদ্ধ লাগাতেও ওস্তাদ। পূর্ণিমাতে চঞ্চলা লক্ষীর অধিষ্ঠান, পান থেকে চুন খসলে সংসারে নৈরাজ্য অবধারিত। ভয়ে গৃহস্থ গান ধরে 'ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে ...'

বাজারে সাতসকালে অমলবাবু আর বিমলবাবুর তুমুল ঝগড়া, ভাঁড়ের চা তুফানি ধাক্কায় ধুতিতে পড়ল খেয়াল নেই। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমলবাবু তবু বলে চলেছেন দেখুন শিক্ষার কি অগ্রগতি! একটা গ্রামের ছেলে ইসরোকে চাঁদে পৌঁছে দিল। বাবা মার গর্ব। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কেরানি বিমলবাবু বলে উঠলেন থামুন মশাই, বাড়ীতে তিনটে ছেলে বেকার আর বাড়ির সামনে ত্রিফলা জ্বলছে। দেশের মানুষ দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায় না, কোটি কোটি টাকা খরচ করে চন্দ্রভিযান হচ্ছে, জানিনা এটা আবার সার্জিকাল স্ট্রাইক না হয়ে যায়। আর ছাত্র যেভাবে শিক্ষকদের গালে চড় মারছে তাতে মনে হয় শিক্ষানীতির এইটাই এই জমানার রীতি। শেষমেষ চা ওয়ালা গোবিন্দ হাত জোড় করে বলে বাবু আমার ঘরে চারটে পেট, আপনারা এরকম করলে দোকান তুলে দিয়ে আকাশের তারা গুনতে হবে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দুজনেই মেঘের আড়ালে চাঁদ লুকোনর মতো সরে পড়লেন।

চাঁদ নামটা নিয়ে কম ঝামেলা, ঠেস বাক্য, টিটকিরি, অধমের বিশেষণ, শিশুদের রুপের প্রশংসা প্রভৃতিতে চাঁদ ব্যবহার হয়। আবার শেষে আকার দিলে তো বুকে হৃদকম্প। এই চাঁদকে ঘিরে ঝকমারি আমরা বুঝতে চাই না, পাড়ায় পাড়ায় এক ধরনের সাইন বোর্ড লাগানো ডাক্তারখানা দেখা যায়, চাঁদসীর চিকিৎসা, ক্ষত সারানো হয় বিনা অস্ত্রে। কিন্তু চিকিৎসার সময় একটা লোহার আঁকশি ব্যবহার করা হয়। ডাক্তাররা বলেন ঐ অস্ত্রটার নাম নাকি বিনা অস্ত্র। বুঝুন চাঁদসীর মহিমা। গ্রামের দিকে চোরপূর্ণিমা পালনা করা হয়। ঐদিন নাকি চাঁদের আলোয় ক্ষেতের কলাটা মুলোটা চুরি করতেই হয়। এতো চুরির সাক্ষী চাঁদ? চাঁদকে নিয়ে এতো অপব্যবহার ভাবা যায় না। খোকাবাবুর বিয়েতে চাঁদ উঠছে, হাতি নাচলেও থানার পুলিশ নাবালক বিবাহ আইনে গ্রেপ্তার করবে। চাঁদ আসলে একটি লোক ঠকানোর বস্তু। স্বামী বাসর ঘরে দুঃখ করে বলছে আজকাল চাঁদের সেই রুপ আর নেই। আসলে স্বামী ভিন্ন নারীতে আসক্ত তাই এড়িয়ে যেতে চাইছে, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে অপামর

বাঙালী সাহিত্যিক ও কবিরা এক মহাসনে চাঁদকে ঠাঁই দিয়েছেন। তাই সে মহামান্য। তাহলে চাঁদের কি হবে? এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অবস্থান বিচার করলে দেখা যাবে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। তার সব কিছুই সূর্যের থেকে ধার করা, তাই তার রূপ মাধুরীও পরনির্ভরশীল। তাই তাকে একা দোষারোপ করা উচিৎ নয়। তাছাড়া আকাশে অগণ্য তারা নিশিদিন কি বিবাদ করিছে তারা কে জানে? এই তারার দলে ভিড়ে সে সুন্দর ও তারাপতি। তাই আমরা চাঁদকে মন মোহিনী করে ভাবি আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বলে ....। আসলে আহার নিদ্রা, সে যুগের মতো চাঁদ আমাদের জীবনে একটা জায়গা করে নিয়েছে। তাই চাঁদকে ছাড়া যায়না। তাজমহল, মহিষাদল রাজবাড়ি, আজিমগঞ্জ রাজবাড়ি চাঁদনী রাতে একটা অন্য রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর সব সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যেন বলতে ইচ্ছে করে 'চাঁদ আসে না কেন আমার ঘরে ....'।

পরিশেষে বলি মৃত্যুর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর সম্পর্ক আমার ভাল লাগেনা। সুন্দর তো কখনও মৃত্যুর চিহ্ন হতে পারে না। চাঁদের যতোই দোষ থাক সে যেন রূপকথার পরী হয়ে আমাদের মনে গেঁথে গেছে। তাই চাঁদকে আমরা বিজ্ঞান নয়, অনুসন্ধান নয়, চাই মনের মানুষ হিসাবে। বাকী কথা পরে হবে। চাঁদের বদগুণকে কলঙ্ক হিসাবে গণ্য করে সোনার চাঁদ ভেবে যেন মনে রাখি। মন খুলে গেয়ে উঠি 'আমি যামিনী, তুমি শশী হে, ভাতিছ গগন মাঝে, ও আমার চন্দ্রিমা'।

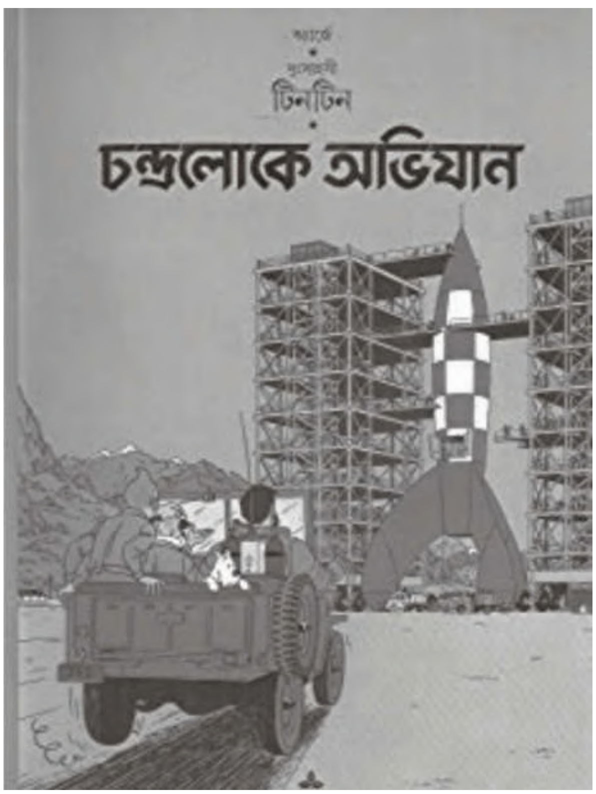

জর্জ রেমি অর্থাৎ হার্জ তাঁর গোয়েন্দা সাংবাদিক টিনটিনকে চাঁদে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে অবশ্যই কুট্টুস এবং ক্যাপ্টেন হ্যাডক। দুঃসাহসী টিনটিনের চাঁদে যাত্রার এই রোমাঞ্চ কাহিনি নিয়ে দুটি বই। বাংলা অনুবাদে বই দু'টির নাম 'চন্দ্রলোক অভিযান' এবং 'চাঁদে টিনটিন।'

সাধের চাঁদ

তাপস বাগ

রতনপুর এলাকার চন্দ্রবাবুকে চেনে না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দায়! গ্রীষ্মের ভরদুপুরে রাস্তায় জনমনিষ্যি না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। রাস্তার ভেলো'টা লেজ নাড়িয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দেবে চন্দ্রবাবুর বাড়িটা কোন দিকে। পিতৃদত্ত নাম অবশ্য চন্দনকান্তি চাকলাদার। তবে ঐ নামে এখন আর কেউ তাকে ডাকে না। এলাকার সকলের কাছে তিনি 'চন্দ্রবাবু' বা 'চাঁদবাবু'। কারণ চন্দনকান্তি বাবুর শয়নে - স্বপনে - জাগরণে শুধুই চাঁদ। নিজের বাড়িটির নাম দিয়েছেন 'চন্দ্রভবন'। একমাত্র মেয়ের নাম 'চন্দ্রিমা'। পোষ্য বিড়ালটিকে আদর করে ডাকেন 'চাঁদু'। বাড়ির উঠোনে যে ফুলের গাছ রয়েছে সেখানেও চাঁদের আলতো ছোঁয়া - 'চন্দ্রমল্লিকা'। কাকতালীয় ভাবে গিন্নির নামের মধ্যেও ঢুকে রয়েছে আবার জোড়া চাঁদ - 'মুনমুন'।

গোঁফ গজানোর সময় থেকেই কলমের ডগায় পদ্য আসতে শুরু করে। ডাইরির পাতায় লিখে গেছেন একের পর এক কবিতা। তবে গত বারো বছর থেকে শুধু চাঁদ নিয়েই কবিতা লিখে চলেছেন। সেই চন্দ্রকিরণসুধা সিঞ্চিত ছড়া- কবিতার সংখ্যা প্রায় তিনশো ছুঁই- ছুঁই। চন্দ্রসুবাসিত নিবন্ধও হাফ সেঞ্চুরি পেরিয়ে গেছে। যদিও অধিকাংশই অপ্রকাশিত। সম্পাদকের কঠিন হৃদয়কে চাঁদ জ্যোৎস্নায় বিহ্বল করতে পারেনি। তাই বাতিলের খাতায় মুখ গুঁজেছে। তবে চন্দ্রবাবু এসব পরোয়া করেন না। আইজ্যাক নিউটনকেও তো আপেল ছোঁড়াছুড়ি করতে দেখে পাবলিক পাগল বলেছিল তাতে কী! সময়ই বলে দেবে কার দৌড় কতোটা।

মেয়ে চন্দ্রিমাকে শিশুবয়সে ঘুম পাড়াতে শুনিয়েছিলেন 'চাঁদ উঠেছে/ ফুল ফুটেছে / কদমতলায় কে/ হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে / খুকুমনির বে।' আদর করে বলেছেন —

'আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
মাছ কাটলে মুড়ো দিব
ধান ভাঙলে কুড়ো দিব
কালো গরুর দুধ দিব
দুধ খাবার বাটি দিব
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।' — এই ধরণের একাধিক চন্দ্রমুখী ছড়া।

চাঁদ নিয়ে অজস্র তথ্য ও ছবি রয়েছে চন্দ্রবাবুর জিম্মায়। চাঁদের মাটিতে পা দেওয়া নিল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন থেকে দ্বাদশ ব্যক্তি ইউজিন কারনান প্রত্যেকের বড় বড় রঙিন ছবি রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো। রয়েছে চাঁদের মাটির এবড়ো খেবড়ো গর্ত, চাঁদ থেকে আনা আধলা পাথর, নিল আর্মস্ট্রং-এর জুতো ও আরোও কিছু চাঁদ কিস্‌সার ছবি। প্রতিদিন ধুলো - ঝুল ঝেড়ে সাফ-সুতরো রাখেন ছবিগুলো। রতনপুরে খোঁজ খবর চালিয়ে দেখেছেন চাঁদ নামধারী মানুষ রয়েছেন মোট ন'জন। জোড়া দিঘির পাড়ে থাকে কালাচাঁদ ও গোরাচাঁদ নামের দুই যমজ ভাই। শিবতলায় বাড়ি সুখচাঁদ ও চন্দ্রকান্ত-র। হাটখোলা বাজারে ফুল বেচে নয়নচাঁদ, পাতিলেবু নিয়ে বসে পূর্ণচাঁদ। ভুড়িওলা শশীভূষণের মহাজনী কারবার। ছেলে চন্দ্রশেখর শহরের বিখ্যাত ইংরাজী স্কুলে পড়ে। বাকি রইল বলাই। স্টেশন ধারে ব্রিজের তলায় কিছুদিন হল একটা সেলুন খুলেছে বলাইচাঁদ মন্ডল। চন্দ্রবাবু গান শুনতে ভালোবাসেন। একবার ছোকরা বয়সে এক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে কিংবদন্তী রফি সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন - 'চত্তধবি কা চাঁদ হো ....' গানটি গাইবার জন্য। কথা রেখেছিলেন সঙ্গীত সম্রাট।

কয়েকদিন আগে চন্দ্রবাবু একটা পুরনো টেলিস্কোপ বাড়িতে এনেছেন। ছাদের উপর তুলে রোজ সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ, শুকতারা, নক্ষত্র একটার পর একটা দেখতে থাকেন। বাল্যবন্ধু সুবিনয়-এর ছেলে শোভন বিজ্ঞানের ছাত্র, আকাশচর্চা করে। সে এসে মাঝেমধ্যে টেলিস্কোপ ধরে সৌরজগতের চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। চন্দ্রিমার কলেজ বান্ধবীরাও মাঝে মধ্যে দল বেঁধে আসে। টেলিস্কোপে চোখ রাখে। মোবাইলে চুকুস্ - চুকুস্ ছবি তোলে। আদিখ্যেতা করে কেউ সেলফিও নেয়।

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে চন্দ্রবাবু রেডিওতে একমনে শুনছিলেন মান্না দে-র সেই কালজয়ী গান - 'ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে ....।' কলিং বেল বেজে উঠল টিং - টং, টিং - টং! দরজার ছিটকিনি খুলতেই দেখতে পেলেন 'হাটটি মাটিম' ক্লাবের দুই সদস্য মৈনাক ও দেবরাজকে। মৈনাক শুরু করল —

'স্যার এবারে পঞ্চমীর দিন আমাদের দুগ্গাপুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আপনাকে বিশেষ অতিথি করা হয়েছে। এই নিন ইনভাইট কার্ড। আসতেই হবে —'

— 'তা কী করছ এবার? গতবারে তো বাঁশের কেল্লা করেছিলে।'

— এবারে স্যার দারুন থিম, এক্কেবারে চমকে দেব।

— বল কী হে! তাজমহল না কী?

— না, এবারে হাটটি মাটিম ক্লাবের থিম হল - চন্দ্রবিজয়।

— মানে?

— আস্ত প্যান্ডেলটাই হচ্ছে চন্দ্রপিষ্ঠ। উপরে দেবী দশভুজা। মহাকাশচারীর পোষাকে মহিষাসুর। থাকছে অ্যাপেলো-১১ চন্দ্রযান। ঈগল নামক চন্দ্রযান থেকে চাঁদের মাটিতে বেরিয়ে আসবে নিল আর্মস্ট্রং পিছনে এডুইন অলড্রিন। দু'জনে চাঁদের মাটিতে পায়চারি করে, হাতুড়ি দিয়ে একটা জায়গায় পুঁতে দেবে মার্কিন পতাকা। সঙ্গে লেজার লাইটের ম্যাজিক! ওফ! ভাবতেই গায়ে কাঁটা।

— এ যে এক্কেবারে ফাটাফাটি কান্ড! তা এমন অভিনব আইডিয়াটা এল কার মাথায়?

— এবারে আমাদের থিম ভাবনায় আপনারই কন্যা চন্দ্রিমা চাকলাদার।

— সত - তি!

— তিন সত্যি!

চন্দ্রবাবুর হৃদমাঝারে সহসা বেজে উঠল — 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে ....।'

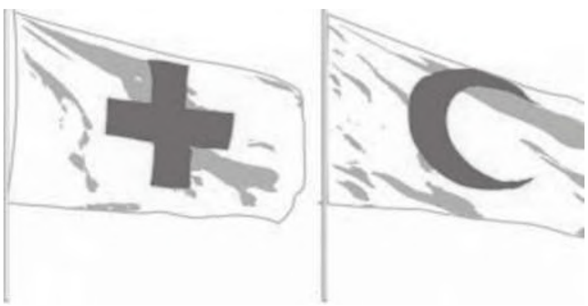

মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবার কাজে নিয়োজিত 'রেড ক্রস' ১৯৮৬ সালের পর তাদের লোগোতে বদল আনে। লাল ক্রসের সঙ্গে যুক্ত হয় লাল চাঁদ। একে 'রেড ক্রিসেন্ট' বলা হয়। 'রেড ক্রস', 'রেড ক্রিসেন্ট' ছাড়াও আর একটি লোগো আছে যাকে 'রেড ক্রিস্টাল' বলা হয়।

গ্রিক পূরাণে চাঁদের দেবতা সেলিনি

'মুন ফ্লাওয়ার' অর্থাৎ চাঁদের ফুল, বিজ্ঞানসম্মত নাম ইপোমোয়িয়া আলবা।

হঠাৎ যদি চাঁদ হারিয়ে যায়

পারমিতা সরকার

চাঁদ নিয়ে পৃথিবীর মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। চাঁদ সম্বন্ধে জানতে তাই বারবার মানুষ চেষ্টা করেছে চাঁদে পদার্পণ করার। সাফল্য এলেও অকৃতকার্য হয়েছে বহুবার। তা সত্ত্বেও চাঁদের বিষয়ে জানার অদম্য ইচ্ছা, কৌতুহল মানুষের থামেনি। পৃথিবীর নানা দেশের নানা বৈজ্ঞানিক বছর বছর ধরে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে চাঁদের বিষয়ে নানা তথ্য উদ্‌ঘাটন করছেন এবং আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হচ্ছে ধীরে ধীরে।

কিন্তু হঠাৎ করে যদি চাঁদ হারিয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় সৌর পরিবার থেকে — কী হবে তাহলে!!

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের কেন্দ্রের গড় দূরত্ব হচ্ছে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৯৯ কিমি। প্রায় চার হাজার কোটি বছর আগে পৃথিবীর কক্ষপথে তৈরী হয়েছিল চাঁদ। তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ছিল প্রায় ১৪ হাজার মাইল। এরপর চাঁদ প্রতিবছর পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে প্রায় চার সেন্টিমিটার করে দূরে সরে যাচ্ছে।

পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হল চাঁদ। প্রায় চার বিলিয়ন বছর ধরে চাঁদ পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছে। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে এক মঙ্গলগ্রহের আকারের বস্তু পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। এবং এই ভয়ানক সংঘর্ষে পৃথিবীর কিছু ধ্বংসাবশেষ পৃথিবী থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে যায় যা ধীরে ধীরে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীদের মতে এরপর থেকেই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়।

প্রাণীর জীবনধারণের জন্য চাঁদের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা সকলেই জানি পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা হয় চাঁদের কারণে। চাঁদের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর সেই অংশের জলরাশি ফুলে ওঠে এবং এর বিপরীত অংশেও জলরাশি ফুলে ওঠে সূর্যের আকর্ষণ বলের প্রভাবে। কিন্তু যেহেতু সূর্য পৃথিবী থেকে বহুদূরে অবস্থান করে সেই আকর্ষণ কিছুটা কম হয়। কিন্তু এতে দু'দিক থেকে জলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। কিন্তু চাঁদ না থাকলে সমুদ্রের জলের ভারসাম্য ঠিক থাকতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বিশাল আকারে জলরাশি আছড়ে পড়বে জনপদের উপর। এতে জন্ম নেবে সুপার সুনামি। আমাদের এই আধুনিক সভ্যতা ধ্বংস হবে এবং এক নিমেষে। যেহেতু চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর দুই প্রান্তের জলরাশি ফুলে থাকে, চাঁদ না থাকলে সেই জলরাশি একে অপরের দিকে ধেয়ে আসবে প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চতায়। আর সলিল সমাধি ঘটবে পৃথিবীর জনজীবনের।

আবহাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তন হবে সাংঘাতিক। দিন ও রাতের তাপমাত্রার ফারাক হবে মারাত্মক। সকালে ৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে রাতে তা হবে ৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ঋতু বলে থাকবে না কিছু। চাঁদের অবস্থানের কারণে পৃথিবী একটি ভারসাম্য বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। চাঁদের অনুপস্থিতিতে এই ভারসাম্য থাকবে না। পৃথিবীর নির্দিষ্ট গতিতে নিজস্ব কক্ষপথে ঘোরার ক্ষমতা লোপ পাবে। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা থাকবে না, থাকবে না ঋতু পরিবর্তন।

সমুদ্রের ভারসাম্য নষ্ট হবে জোয়ার ভাটা না হওয়ার কারণে। বিপন্ন হবে সামুদ্রিক জীব। সমুদ্রের খাদ্যশৃঙ্খল নির্ভর করে জোয়ার ভাটার উপর। তাই চাঁদ না থাকলে ধীরে ধীরে শেষ হতে হবে সামুদ্রিক প্রাণীদের। যেসব প্রাণীরা অভিযোজন করতে পারে, বা শক্তিশালী প্রাণীরা ধীরে ধীরে টিকে থাকার চেষ্টা করবে কিন্তু অবলুপ্ত হবে দুর্বল প্রাজাতি। যারা টিঁকে যাবে তারা হয়তো হবে অনেক বেশি শক্তিশালী।

বলা যেতে পারে চাঁদ না থাকলে পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হবে প্রাণ শক্তি। জন্ম নেবে অন্য এক পৃথিবী যেখানে দিনের সময় সীমা হবে ৬-১০ ঘন্টা। আর রাতের আকাশ ঢেকে যাবে চাঁদ বিহীন তারায় ভরা নিকষ কালো অন্ধকারে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হবে না। কারণ চাঁদ না থাকলে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কোনটাই ঘটতে পারবে না। তখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের জ্যোতিষ্ক হবে শুক্রগ্রহ। চাঁদের অভাবে পরিবর্তন ঘটবে পৃথিবীর আয়তনের। তখন পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি বেড়ে যাবে, সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের প্রভাবে একদিন ৬ থেকে ১০ ঘন্টায়। এর ফলে পৃথিবীর বিষুবরেখার আয়তন বেড়ে যাবে ও মেরু অঞ্চল আরো চ্যাপ্টা হবে। পৃথিবী হবে ডিম্বাকৃতি।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল চাঁদ কি সত্যিই হারিয়ে যেতে পারে, বা ধ্বংস হতে পারে? উত্তর হল হ্যাঁ। প্রতিবছর চাঁদ যেভাবে ৪ সে.মি. করে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাতে এক সময় পৃথিবীর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে পারে। যদিও সেদিন আসতে এখনও হাতে আছে প্রায় লক্ষ বছর। অথবা প্রাকৃতিক কোন বিস্ফোরণে ধ্বংস হতে পারে আমাদের চাঁদ। তখন কিন্তু এক কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়বে আমাদের সাধের পৃথিবী।

চাঁদের বুড়ি (১)

প্রণবকুমার দাস

মাগো আমায় বলতে পারো —
চাঁদে থাকে চাঁদের বুড়ি
সর্বদা সে চরকা কাটে
এত সুতো কোথায় যায়?
নাতি-নাতনি আছে কি তার
রান্না-বান্না করে কোথায়
সারাটা দিন কিই-বা খায়?
মাগো বুড়ির বয়স কত
ঠাকুমার চেয়ে বেশি?
মনে দুঃখ আছে কি তার
নাকি, সব সময়ই খুশি?
ওখানে কি মা, ফুচকা মেলে
প্যাটিস, চাউমিন, রোল?
খাবার নিয়ে কি নাতি- নাতনিরা
বাঁধায় গন্ডগোল?
বুড়ি কি মা গল্প বলে
আমার ঠাকুমার মতো?
রূপকথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী
আরো আরো কতো
ইচ্ছে করে বুড়ির কাছে
চাঁদের দেশে যাই
ওখানে যাওয়ার টিকিটটা যে
কোন স্টেশনে পাই?
হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো
তবে কি এটা স্বপ্ন ছিলো?
মা গল্প শুনিয়ে ছিলো
তাই, প্রশ্নগুলো মনে এলো।
এখন, চন্দ্রযান চাঁদে যায়
ক্ষণে ক্ষণে খবর পাঠায়।
চাঁদের বুড়ি চাঁদে নেই
আছে শুধুই গল্পেতেই।

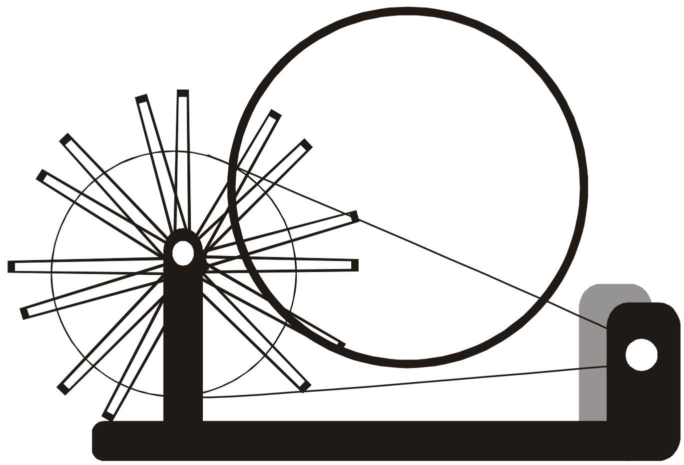

চাঁদের বুড়ি (২)

সুজয় বাগচী

আলোর প্রকাশ আকাশ জুড়ে
চাঁদ উঠেছে হেসে।
যুগ যুগান্ত ধরে ছড়িয়ে পড়ে
আমার গলিতে এসে।।
মোনালিসার হাসি জ্যোস্না হয়ে
পদ্ম দীঘির ঘাটে।
রূপালি আলোর ছড়িয়ে ছটা
জ্যোস্না হাসে মাঠে।।
আলোক বিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে
ঐ নীলাকাশ থেকে।
যেন কোন মায়াবী ছবি
স্বপ্ন আঁকে চোখে।।
একটা বুড়ি চরকা কাটে
চাঁদের মধ্যে বসে।
ঘুম পাড়ানি গান সে শোনায়
আমায় ভালোবেসে।।

মানুষের চন্দ্রাভিযান

শ্রাবন্তী ব্যানার্জী

চাঁদ রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তবে এটি তার নিজস্ব আলো দেয় না। এটি আসলে সূর্য থেকে পাওয়া আলোকে প্রতিফলিত করে। সূর্য থেকে মাত্র সাত শতাংশ আলো প্রতিবিম্বিত হয়। কখনও কখনও, চাঁদ আকার পরিবর্তন করে দেখা দেয় , তবে তার কারণ সূর্য চাঁদের বিভিন্ন অংশকে আলোকিত করে বলে। চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়া দিয়ে চলে যায় এবং পৃথিবী ঠিক সূর্য এবং পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময়ে আসে তখন তাকে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। এটি তখনই হয় যখন চাঁদ ম্লান হয়ে যায় এবং এটি তামাটে বর্ণে পরিণত হয়।

পৃথিবী থেকে দেখলে চাঁদ গাড় নীল এবং ধূসর রঙের মনে হবে। চাঁদের অন্ধকার অংশগুলি বিস্তৃত, সমতল, সমভূমি (Flat Place) যা প্রথম ইতালিও বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৬০৯ সালে একটি Telescope-এর মাধ্যমে চাঁদের দিকে তাকান। সম্ভবত, তিনি মনে করেছিলেন যে সমভূমিগুলি জল ছিল কারণ তিনি তাদের Maria বলে অভিহিত করেছিলেন, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ 'সমুদ্র'। আজ বহু গবেষণার পর আমরা আবিষ্কার করেছি যে এগুলি আসলে বিশাল, গভীর গর্ত যার প্রান্তগুলি পাথর ও মাটি দিয়ে ঢাকা। 'মারিয়া' শব্দটি বোঝায় যে চাঁদে জল রয়েছে তবে আমরা জানি যে এর কোন অস্তিত্ব নেই। যেহেতু চাঁদে জল নেই, সেখানে জীবন থাকতে পারে না। পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহের মতো চাঁদেরও কোনো বায়ুমন্ডল নেই। আকাশ নিয়মিত কালো থাকে, তবে তারাগুলি দৃশ্যমান। রাতে চাঁদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পৃথিবীর যে কোনও স্থানের চেয়ে শীতল হয়ে যায় তবে দিনের বেলা শিলাগুলি ফুটন্ত জলের চেয়ে কিছুটা গরম থাকে। চাঁদে যদিও কোনো বায়ুমন্ডল নেই এবং তরল জলও নেই, তবে এখন প্রমাণ হয়েছে যে দক্ষিণ মেরুতে বরফ রয়েছে যা স্থায়ী ভাবে ছায়াযুক্ত। উত্তর মেরুতেও বরফ রয়েছে। Hydrates এবং Hydroxides এর আকারে। তরল জল চাঁদে বিদ্যমান থাকতে পারে না কারণ Photodissociation দ্রুত অণুগুলি ভেঙে দেয়।

শীতল যুদ্ধের (Cold War) সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পৃথিবীতে লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করতে সক্ষম, এমন একটি সামরিক ঘাঁটি চাঁদে তৈরীর বিষয়ে চিন্তা করেছিল। তবে নাসা সেনা থেকে একটি বেসামরিক ভিত্তিক Agency তে স্থানান্তরিত হওয়ায় উভয় পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়।

যদিও Soviet Union প্রথম মহাকাশ অভিযানের কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ায় চাঁদে আধিপত্য চেয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশের কয়েকটি পতাকা অভিযানের সময় চাঁদের জমিতে পুঁতে আসে এবং এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত কিন্তু পরে ব্যপারটি মিটে যায় কারণ আর্ন্তজাতিক নিয়মানুসারে কোন দেশেরই চাঁদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই 'Outer Space Treaty' তে স্বাক্ষর করেছিল যে চুক্তি শুধু চাঁদ নয় সমস্ত মহাকাশীয় জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূলত আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপিয় দেশগুলির মহাকাশ দৌড়ে অংশগ্রহীতা ছিল, সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের মতো অন্যান্য দেশ মহাকাশ দৌড়ের দিকে অতটা মনোযোগী হয় না। তবে ভারতই এই 'Space Race' এ ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং চাঁদে একটি মানুষ বিহীন মহাকাশযান (Moon Vehicle) চালু করেছে। মহাকাশযানটি অন্ধ্রপ্রদেশের সতীশ ধাওয়ান স্পেশ সেন্টার শ্রী হরিকোটা থেকে PLSVXL- এর পরিবর্তিত সংস্করণে চালু হয়েছিল। চন্দ্রায়ন-১ হল ভারতের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা - 'Indian Space Reserch Organisation'-ইশরো'র চাঁদে ভারতের প্রথম মিশন। সম্প্রতি ২২ জুলাই ২০১৯, ভারত সফলভাবে চন্দ্রায়ন-২ মিশন চালু করেছে। মিশনটি একটি অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার প্রেরণ করবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অন্বেষণ করতে। আশা করা যায় এই ভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক উপগ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হবে।

এক কল্পনাতীত ফাইনাল ম্যাচ

সুরজিৎ দাস (দশম শ্রেণী)

সত্যিই কল্পনার অতীত, রূপকথাও যেন হার মানে। এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ এমনই এক রুদ্ধশ্বাস ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল। ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখটি ক্রিকেটের ইতিহাসের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমবার বিশ্ব জয়ের সুযোগ পেয়েছিল আয়োজক ইংল্যাণ্ড এবং নিউজিল্যাণ্ড। সেমিফাইনালে দুই দল যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতকে হারিয়ে ফাইনালের মহাযুদ্ধে উপস্থিত হয়। প্রথম ব্যাট করে নিউজিল্যাণ্ড ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪১ রান তোলে টম ল্যাথাম (৪৫) এবং হেনরি নিকোলাসের (৫৫) সৌজন্যে। অন্যদিকে মার্ক উড ৩টি উইকেট নেন। ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই বিপাকে পড়ে, ৮১ রানে তাদের ৪টি উইকেট চলে যায়। কিন্তু তারা ছাড়ার পাত্র নয়। বেন স্টোকস ও জস বাটলার জুটি ১০০ রানের পার্টনারশিপে শক্ত ভিত গড়ে দিলেও বাটলার আউট হতেই আবার ব্যাটিং বিপর্যয় দেখা দেয়। স্টোকস একা লড়ে ম্যাচ শেষ ওভারে নিয়ে আসে। শেষ ওভারে কেন উইলিয়ামসের বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্ব এবং ট্রেন্ট বোল্টের আঁটোসাঁটো বোলিং ইংল্যাণ্ডকে ২৪১ রানেই আটকে দেয়। অর্থাৎ ম্যাচ ড্র। এখানেই শেষ নয়, এরপর শুরু হ'ল বিজয়ী নির্ধারণের রুদ্ধশ্বাস লড়াই 'সুপার ওভার'। প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যাণ্ড। বেন স্টোকস ও জস বাটলার নিউজিল্যাণ্ডের ট্রেন্ট বোল্টের ওভার থেকে ১৫ রান সংগ্রহ করে। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে দুই কিউয়ি ব্যাট্‌সম্যান জিমি নিশাম ও মার্টিন গাপ্টিল ইংল্যাণ্ডের জোফ্রা আর্চারের আগুনে বোলিং সামলে সেই ১৫ রানই তোলে। প্রথমে ৫০ ওভার ও পরে সুপার ওভারেও ফলাফল অমিমাংসিত রয়ে যাওয়ায় ম্যাচে বেশী বাউন্ডারি মারার জন্য ইংল্যাণ্ডকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। লর্ডসের মাটিতে গোটা বিশ্বকে সাক্ষী করে বিশ্বকাপ জিতল ক্রিকেটের জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড, যদিও বহু আকাঙ্ক্ষিত এই জয় নিষ্কলঙ্ক হল না, লেগে থাকল বিতর্ক। খেলার ৫০তম ওভারের চতুর্থ বলে বেন স্টোকস দ্বিতীয় রান নেওয়ার সময় বাউণ্ডারি থেকে গাপ্টিলের ছোঁড়া বল তার ব্যাটে লেগে (উপরের ছবিতে) থার্ডম্যান বাউণ্ডারী দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা ইংল্যাণ্ডকে মোট ৬ রান দেয় এবং ৩ বলে ৯ রান থেকে ২ বলে ৩ রানের সহজ লক্ষ্যে এসে দাঁড়ায়।

জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার সকল পাঠক ও পাঠিকাদের জানাই শারদ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মডার্ণ ডিজিট্যাল স্টুডিও এন্ড জেরক্স সেন্টার

পাশপোর্ট (রঙিন ও সাদা কালো), স্টীল ও ভিডিও ছবি তোলা হয়
এখানে খাতা, পেন, পেনসিল সহ স্কুল সরঞ্জাম ও জেরক্স এর ব্যবস্থা আছে।

õ÷ù ðùÿÅ×9775130320—
æûþÅÂþ÷±hÂ•ï ±ò±õþü±Ëõ—,ý±ÝhÂ¼

Best Wishes for Durga Puja from Subrha Senapati

hp

DELL

lenovo

acer

S. S. Infotech

144, Narashingha Dutta Road,
Kadamtala, 1st. Floor, Howrah - 711101
(Opp. Kadamtala Bus Stand)

(M) 9830236471 (O) 2643 1102
e-mail : subhra_se@yahoo.co.in

প্রয়াস অবলম্বন পরিযায়ী শিশুদের বিদ্যালয়

প্রয়াস একটি অসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ২০০৯ সালে প্রয়াস একটি অভিনব কাজে হাত লাগায়, সেটি হল 'প্রয়াস অবলম্বন পরিযায়ী শিশুদের বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তফশিলী উপজাতির শিশু যাদের বাবা-মায়েরা ইট ভাটার শ্রমিক। এই সব আদিবাসী শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশা থেকে কাজের সন্ধানে আসে সঙ্গে আনে তাদের সন্তান সন্ততিদের। এই সব শিশু বা ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় বা বাবা মায়েদের সঙ্গে কাজে সহযোগিতা করে। তাই তাদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রয়াসের এই অভিনব প্রয়াস। প্রয়াসের কাজে উৎসাহিত হয়ে আশা ফর এডুকেশন কলোরাডো, ইউ.এস.এ. চ্যাপ্টার এগিয়ে এসেছে। এদের বদান্যতায় একটা বিদ্যালয় গৃহ তৈরী হয়েছে এ ছাড়া বিদ্যালয় চালানোর আনুষাঙ্গিক খরচ খরচা ওনারাই বহন করেন। তবে আরো তিনটি বিদ্যালয় মুক্তাঙ্গনে চলে এবং হিতৈষীদের দানে চালিত হয়। ইটভাটাগুলোতে ৮মাস কাজ হয়। সাধারন ভাবে নভেম্বর থেকে জুন এই আট মাস। তারপর কাজ থাকেনা বলে সকলে যে যার রাজ্যে ফিরে যায়। নিজের রাজ্যে ৪মাস থেকে আবার কাজের জায়গায় চলে আসে। আমাদের বিদ্যালয়ও তাই আটমাস চলে। বাকি ৪মাসের জন্য প্রয়াস আপাতত ঝাড়খণ্ডে ৮টা বিদ্যালয়ে এবং ১০টা আই.সি.ডি.এস. সেন্টার-এ তাদের ভর্তি করিয়েছে সাথে সাথে ঐসব বিদ্যালয় ও আই.সি.ডি.এস. কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তাদের বোঝানো হয়েছে বিষয়টা অর্থাৎ কেন তারা এখানে ৪ মাস পড়বে। অধিকন্তু প্রয়াস কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে ঝাড়খণ্ডের ঐসব বিদ্যালয়ের ও আই.সি.ডি.এস. এর শিক্ষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রগতি পরিলক্ষণ করেন। সেই সঙ্গে এই সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোচিং এর ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে বাবা-মাদের সাথে প্রতি মাসে মিটিংএর আয়োজন করা হয় ও নির্বাচিত কিছু পরিবারের গৃহ পরিদর্শন করা হয়। এই প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ফলে তাদের মধ্যে কিছু সচেতনতা জাগ্রত হয়েছে। যেমন —

১. শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
২. শিশু স্বাস্থ্য ও টিকাকরণ।
৩. আধার, রেশন কার্ডের প্রয়োজনীয়তা।
৪. পরিবার পরিকল্পনা।
৫. শিশু বিবাহ রোধ।
৬. অবৈধ শিশু পাচার রোধ।
৭. আর্থিক পরিকল্পনা।
৮. বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প।

Prayas's Culture ----

* Be collaborative
* Be accountable
* Be cost-effective
* Make a difference

এপর্যন্ত আমরা ৭টা ইটভাটায় শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি যদিও আমাদের হাওড়া জেলায় শ্যামপুর (১) ও (২) ব্লকে ২০০টিরও বেশী ইটভাটা আছে। কিন্তু আমাদের সবথেকে বড় কৃতিত্ব হল আমরা ৭টা ইটভাটাকেই শিশুশ্রমিক মুক্ত করেছি। পরিশেষে বলতে চাই, এখনও বহু শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আসুন, দেখুন এবং আমাদের কাজের আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন আশা করি।

প্রয়াস

প্রয়াস

PRAYAS

Progressive Rural Active Youth's Action for Society

www.prayas.bharat.org <> prayasindia.org@gmail.com <>836509314